সূচীপত্র

مجلة عرفات الأسبوعية
شعار التضامن الإسلامي

সাপ্তাহিক আরাফাত

মুসলিম সংস্কৃতির আহ্বায়ক

প্রতিষ্ঠাতা: আল্লামা মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী আল-কোরায়শী (রহ)

১৩ নভেম্বর ২০২৩ ◈ সোমবার ◈ বর্ষ: ৬৫ ◈ সংখ্যা: ০৭-০৮

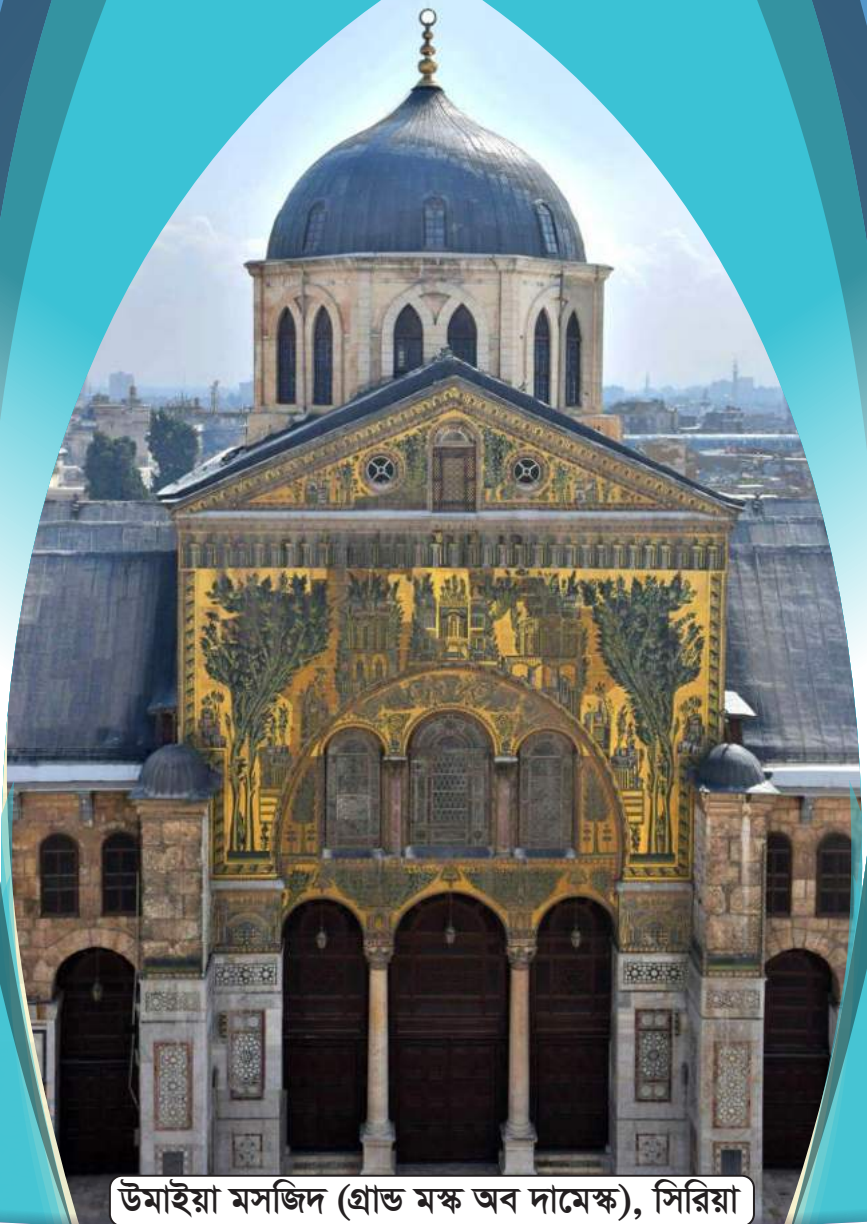

উমাইয়া মসজিদ (গ্রান্ড মস্ক অব দামেস্ক), সিরিয়া

সাপ্তাহিক
আরাফাত
প্রতিষ্ঠাকাল- ১৯৫৭
মুসলিম সংহতির আহ্বায়ক

عرفات الأسبوعية
شعار التضامن الإسلامي
مجلة أسبوعية دينية أدبية ثقافية وتاريخية الصادرة من مكتب الجمعية

প্রতিষ্ঠাতা : আল্লামা মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী আল-কোরায়শী (রহ)
সম্পাদকমন্ডলীর প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি : প্রফেসর ড. মুহাম্মদ আব্দুল বারী (রহ)

গ্রাহক ও এজেন্ট হওয়ার নিয়মাবলী

বছরের যে কোনো সময় গ্রাহক হওয়ার যায়। ছয় মাসের কমে গ্রাহক করা হয় না। প্রতি সংখ্যার জন্য অগ্রীম ১০০/- (একশ টাকা) পাঠিয়ে বছরের যে কোন সময় এজেন্সি নেওয়া যায়। ১০ কপির কমে এজন্সি দেওয়া হয় না। ১০-২৫ কপি পর্যন্ত ২০%, ২৬-৭০ কপির জন্য ২৫% এবং ৭০ কপির উর্দ্ধে ৩০% কমিশন দেওয়া হয়। প্রত্যেক এজেন্টকে এক কপি সৌজন্য সংখ্যা দেওয়া হয়। জামানতের টাকা পত্রিকা অফিসে নগদ অথবা বিকাশ বা সাপ্তাহিক আরাফাতের নিজস্ব একাউন্ট নাম্বারে জমা দিয়ে এজেন্ট হওয়া যায়।

ব্যাংক একাউন্টসমূহ

বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লি.
নওয়াবপুর রোড শাখা
সঞ্চয়ী হিসাব নম্বর-২০৫০১১৮০২০০২৮৫৬০০
যোগাযোগ : ০১৯৩৩৩৫৫৯০১

বিকাশ নম্বর
০১৯৩৩৩৫৫৯০৫
চার্জসহ বিকাশ নম্বরে টাকা প্রেরণ করে উক্ত নম্বরে ফোন করে নিশ্চিত হোন।

সাপ্তাহিক আরাফাত
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লি. বংশাল শাখা
সঞ্চয়ী হিসাব নম্বর-২০৫০১৭৯০২০১৩৩৫৯০৭
যোগাযোগ : ০১৯৩৩৩৫৫৯১০

মাসিক তর্জুমানুল হাদীস
শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক লি.
বংশাল শাখা
সঞ্চয়ী হিসাব নম্বর-৪০০৯১৩১০০০০১৪৪০
যোগাযোগ : ০১৯৩৩৩৫৫৯০৮

বিশেষ দ্রষ্টব্য : প্রতিটি বিভাগে পৃথক পৃথক মোবাইল নম্বর প্রদত্ত হলো। লেনদেন-এর পর সংশ্লিষ্ট বিভাগে প্রদত্ত মোবাইল নম্বরে ফোন করে নিশ্চিত হওয়ার জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে।

আপনি কি কুরআন ও সহীহ সুন্নাহ মোতাবেক আলোকিত জীবন গড়তে চান?
তাহলে নিয়মিত পড়ুন : মুসলিম সংহতির আহ্বায়ক

সাপ্তাহিক আরাফাত
মুসলিম সংহতির আহ্বায়ক

ও কুরআন- সুন্নাহ'র আলোকে রচিত জমঈয়ত প্রকাশিত বইসমূহ

যোগাযোগ
৭৯/ক/৩, উত্তর যাত্রাবাড়ি, ঢাকা- ১২০৪
ফোন : ০২-৭৫৪২৪৩৪, মোবইল : ০১৯৩৩-৩৫৫৯১০
www.jamiyat.org.bd

সূচীপত্র

مجلة عرفات الأسبوعية
شعار التضامن الإسلامي

সাপ্তাহিক আরাফাত

মুসলিম সংস্কৃতির আহ্বায়ক

ধর্ম-দর্শন, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও ইতিহাস-ঐতিহ্য বিষয়ক সাপ্তাহিকী

প্রতিষ্ঠাকাল - ১৯৫৭
রেজি - ডি.এ. ৬০
প্রকাশ মহল - ৯৮, নবাবপুর রোড,
ঢাকা-১১০০, বাংলাদেশ

প্রতিষ্ঠাতা: আল্লামা মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী আল-কোরায়শী (রহ)

* বর্ষ : ৬৫
* সংখ্যা : ০৭-০৮
* বার : সোমবার

◈ ১৩ নভেম্বর-২০২৩ ঈসায়ী
◈ ২৮ কার্তিক-১৪৩০ বঙ্গাব্দ
◈ ২৮ রবিউস্ সানি-১৪৪৫ হিজরি

সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি
অধ্যাপক ডক্টর আব্দুল্লাহ ফারুক

সম্পাদক
আবু আদেল মুহাম্মাদ হারুন হুসাইন

সহযোগী সম্পাদক
মুহাম্মদ গোলাম রহমান

প্রবাস সম্পাদক
মুহাম্মাদ রফিকুল ইসলাম মাদানী

ব্যবস্থাপক
রবিউল ইসলাম

উপদেষ্টামণ্ডলী
প্রফেসর এ. কে. এম. শামসুল আলম
মুহাম্মদ রুহুল আমীন (সাবেক আইজিপি)
আলহাজ্জ মুহাম্মদ আওলাদ হোসেন
প্রফেসর ড. দেওয়ান আব্দুর রহীম
প্রফেসর ড. আ. ব. ম. সাইফুল ইসলাম সিদ্দিকী
অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ রঈসুদ্দীন

সম্পাদনা পরিষদ
প্রফেসর ড. আহমাদুল্লাহ ত্রিশালী
উপাধ্যক্ষ ওবায়দুল্লাহ গযনফর
প্রফেসর ড. মো. ওসমান গনী
ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ খান মাদানী
উপাধ্যক্ষ আব্দুল্লাহ আল মাহমুদ
মুহাম্মদ ইবরাহীম বিন আব্দুল হালীম মাদানী

যোগাযোগ

সাপ্তাহিক আরাফাত

জমঈয়ত ভবন, ৭৯/ক/৩, উত্তর যাত্রাবাড়ী, বিবির বাগিচা ৩নং গেইট, ঢাকা-১২০৪।

সম্পাদক	: ০১৭৬১-৮৯৭০৭৬	বিপণন অফিসার	: ০১৯৩৩-৩৫৫৯১০
সহযোগী সম্পাদক	: ০১৭১৬-৯০৬৪৮৭	কম্পিউটার বিভাগ	: ০১৯৩৩-৩৫৫৯০৭
ব্যবস্থাপক	: ০১৯৩৩-৩৫৫৯০১	টেলিফোন	: ০২-৭৫৪২৪৩৪

weeklyarafat@gmail.com
www.weeklyarafat.com
jamiyat1946.bd@gmail.com

মূল্য : ২৫/-
(পঁচিশ) টাকা মাত্র।

www.jamiyat.org.bd
f/shaptahikArafat
f/group/weeklyarafat

مجلة عرفات الأسبوعية

تصدر من المكتب الرئيسي لجمعية أهل الحديث ببنغلاديش

٩٨ نواب فور، داكا-١١٠٠.

الهاتف : ٠٢٧٥٤٢٤٣٤، الجوال : ٠٩٣٣٣٥٥٩٠١

المؤسس : العلامة محمد عبد الله الكافي القريشي (رحمه الله تعالى)

الرئيس المؤسس لمجلس الإدارة :

الفقيد العلامة د. محمد عبد الباري (رحمه الله تعالى)

الرئيس الحالي لمجلس الإدارة :

الأستاذ الدكتور عبد الله فاروق (حفظه الله تعالى)

رئيس التحرير : أ/أبو عادل محمد هارون حسين

গ্রাহক চাঁদার হার (ডাকমাশুলসহ)

দেশ	বার্ষিক	সান্মাসিক
বাংলাদেশ	৭০০/-	৩৫০/-
দক্ষিণ এশিয়া	২৮ U.S. ডলার	১৪ U.S. ডলার
এশিয়ার অন্যান্য দেশ	৩০ U.S. ডলার	১৫ U.S. ডলার
সিঙ্গাপুর	৩৫ U.S. ডলার	১৫ U.S. ডলার
ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া ও ব্রুনাই	৩০ U.S. ডলার	১৫ U.S. ডলার
মধ্যপ্রাচ্য	৩৫ U.S. ডলার	১৫ U.S. ডলার
আমেরিকা, কানাডা ও অস্ট্রেলিয়াসহ পশ্চিমা দেশ	৫০ U.S. ডলার	২৬ U.S. ডলার
ইউরোপ ও আফ্রিকা	৪০ U.S. ডলার	২০ U.S. ডলার

“সাপ্তাহিক আরাফাত”

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড

বংশাল শাখা : (সঞ্চয়ী হিসাব নং- ১৩৩৫৯)

অনুকূলে **জমা/ডিডি/টিটি/অনলাইনে** প্রেরণ করা যাবে।

অথবা

“সাপ্তাহিক আরাফাত”

অফিসের বিকাশ (পার্সোনাল) : ০১৯৩৩ ৩৫৫ ৯০৫

নম্বরে বিকাশ করা যাবে। উল্লেখ্য যে, বিকাশে অর্থ পাঠানোর পর কল করে নিশ্চিত হোন!

সূচিপত্র

- **সম্পাদকীয়** ০৩
- **আল কুরআনুল হাকীম :**
  - ❖ **অন্যায় হত্যাযজ্ঞ মানব সভ্যতা ধ্বংসের নামান্তর**
    আবু আদেল মুহাম্মাদ হারুন হুসাইন- ০৪
- **হাদীসে রাসূল ﷺ :**
  - ❖ **মহান আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করা**
    আবূ তাহসীন মুহাম্মদ- ০৬
- **প্রবন্ধ :**
  - ❖ **নওয়াব সলিমুল্লাহ : বাংলায় নারী শিক্ষার অগ্রদূত**
    আবু সা'আদ ড. মো. ওসমান গনী- ১১
  - ❖ **রাসূল (ﷺ)-এর শাসনব্যবস্থা**
    মূল : ড. হাফিয আহমাদ আজাজ আল কারামি
    ভাষান্তর : তানযীল আহমাদ- ১৩
- **নিভৃত ভাবনা :**
  - ❖ **হক্বের পথে টিকে থাকা কতই না কঠিন!**
    মূল : মানসুর আহমাদ মল্লীক
    গ্রন্থনায় : জহির বিন জাহাঙ্গির- ১৮
- **ক্বাসাসুল হাদীস :**
  - ❖ **খাব্বাব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) ও পূর্ববর্তীদের দ্বীনের জন্য ত্যাগ**
    গিয়াসুদ্দীন বিন আব্দুল মালেক- ২৩
- **বিশেষ মাসায়িল** ২৫
- **সমাজচিন্তা :**
  - ❖ **শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড**
    মো. আরফাতুর রহমান- ২৯
- **আত্মগঠন :**
  - ❖ **নতুন উদ্যমে শুরু হোক তারুণ্যের ভবিষ্যৎ**
    মো. শাওন রহমান- ৩১
- **ইতিহাস-ঐতিহ্য :**
  - ❖ **জেরুজালেমের ইতিহাস যেন পৃথিবীরই ইতিহাস**
    মো. কায়ছার আলী- ৩২
- **কিশোর ভুবন :**
  - ❖ **গাধা যখন গল্প বলে!**
    মূল : আব্দুত তাওয়াব ইউসুফ
    অনুবাদ : আহমাদ রফিক- ৩৪
- **কবিতা** ৩৬
- **স্বাস্থ্য-সচেতনতা** ৩৭
- **ফাতাওয়া ও মাসায়েল** ৪০
- **প্রচ্ছদ রচনা** ৪৪
- **আলোকিত ভুবন** ৪৫

সম্পাদকীয়

সামাজিক শান্তি ও নিরাপত্তা চাই

আদর্শ সমাজ বা রাষ্ট্রের মূল উপাদান আইনের শাসন, সুষ্ঠু অর্থ ব্যবস্থা, জননিরাপত্তা ও সুচিকিৎসা নিশ্চিত করা। এগুলোর সঠিক ভিত্তিমূল প্রতিষ্ঠিত থাকলে পুরো রাষ্ট্র একটি শৃঙ্খলার মধ্যে পরিচালিত হয়। আর এসবের কোনো একটি বা সবক'টি ভেঙ্গে পড়লে পুরো রাষ্ট্র ব্যবস্থাই বিধ্বস্ত হয়ে পড়ে। ইসলাম পূর্ব জাহেলী যুগের সামাজিক অবকাঠামোতে উপর্যুক্ত উপাদানসমূহের অনুপস্থিতির কারণে সেটি বরবর যুগ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছিল। তখনকার বিপর্যস্ত আরব-সমাজ শান্তির অন্বেষায় ব্যাকুল ছিল। কীভাবে জননিরাপত্তা নিশ্চিত করা যায় এবং ভঙ্গুর অর্থ ব্যবস্থাকে ন্যায়-ইনসাফপূর্ণ আদর্শিক নীতিমালার ভিত্তি মূলে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা যায়, সেটিই ছিল দিশেহারা মানুষের একমাত্র চাওয়া। আল্লাহ তা'আলা তাঁর তরফ থেকে ওহী নাযিল করে হারানো পথ ফিরে পাওয়ার সন্ধান দিলেন। ইসলামের আলোকে উদ্ভাসিত হয়ে আরবগণ ফিরে পেলেন তাদের হারানো ঐতিহ্য। আর আল্লাহ তা'আলা সে কথার স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেন, "অতএব তাদের কর্তব্য হলো এই (কা'বা) ঘরের রবের 'ইবাদত করা। যিনি তাদেরকে ক্ষুধায় খাদ্য দিচ্ছেন এবং তাদেরকে ভয়-ভীতি হতে নিরাপদ করেছেন।"

এক্ষণে প্রশ্ন হচ্ছে– উপর্যুক্ত মৌলিক আদর্শের ভিত্তি মজবুতিকরণ কি খুব সহজ? না, মোটেও নয়। যতক্ষণ না সমাজের প্রতিটি মানুষ মহান আল্লাহকে একমাত্র ইলাহ হিসেবে গ্রহণ করবে, আখিরাতে জবাবদিহিতার ভয় ও বিশ্বাস অন্তরে বদ্ধমূল না হবে এবং তার প্রেরিত পুরুষ মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর পথ ও পদ্ধতির যথাযথ অনুসরণ নিশ্চিত না করবে, ততক্ষণ পর্যন্ত সমাজ ও রাষ্ট্র কোনোটিই সঠিক পথে পরিচালিত হবে না। আর বিষাক্ত সমাজের ছোবল থেকে জাতিও মুক্তি পাবে না। আমরা বাস্তবতার দর্পণে দৃষ্টিপাত করলে দেখতে পাবো, বর্তমান সমাজ আজ এ মৌলিক প্রশ্নে দ্বিধাগ্রস্ত। আজ তাওহীদ না থাকায় উন্নত শির নত হচ্ছে যত্রতত্র। আইন থাকলেও তার যথাযথ প্রয়োগ না থাকায় জাতি বিবেকান্ধ। নিয়ন্ত্রনহীন অর্থব্যবস্থা জাতিকে খাঁদের কিনারায় নিয়ে যাচ্ছে। আর চিকিৎসা ব্যবস্থার নৈরাজ্য বলাই বাহুল্য। এহেন পরিস্থিতিতে জাতি আজ ত্রাহি ত্রাহি করছে।

সমাজের মূল স্তম্ভ হচ্ছে ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্র। ইসলাম প্রথমে ব্যক্তি সংশোধনের প্রতি সবিশেষ গুরুত্বারোপ করেছে। ঈমান ও গ্রহণযোগ্য 'আমলের যত্ন নিতে নির্দেশ দিয়েছে। মন্দ ও গর্হিত কাজ হতে বিরত থাকতে কঠোর নির্দেশ প্রদান করেছে। সমাজের নিরাপত্তা বিঘ্ন হয়, এমন কাজকে সর্বোতভাবে নিরুৎসাহিত করেছে। এমনকি এর শাস্তি মৃত্যুদণ্ড বলে জানিয়ে দিয়েছে। অতঃপর আদর্শ সমাজ ও রাষ্ট্র গঠনের লক্ষ্যে পরস্পরকে সৎ উপদেশ দেওয়া ও সবর করার প্রতি যত্নশীল হতে বলেছে। সৎ পরামর্শ দেওয়া ও সত্য বলাকে এমন কল্যাণ বলে অভিহিত করেছে, যা মানুষকে জান্নাতের পথ দেখায়। আর সত্য বলতে থাকলে মহান আল্লাহর নিকট সত্যবাদী বলে পরিগণিত হয়। পক্ষান্তরে মিথ্যা ধ্বংসের পথ দেখায়। মিথ্যাবাদিতা মানুষকে জাহান্নামের দিকে ধাবিত করে দেয় এবং মহান আল্লাহর কাছে মিথ্যাবাদী বলেই আখ্যা পায়। আর 'সবর' মানে বিরত থাকা, আটকিয়ে রাখা বা নিয়ন্ত্রণ করা। বান্দা মহান আল্লাহর 'ইবাদতে নিজেকে নিয়োজিত রাখবে, পাপাচার হতে বিরত থাকবে এবং যে কোনো আপতিত বিপদে ধৈর্যধারণ করবে। এভাবে সমাজের সব মানুষ সত্যবাদিতা ও সবরের ভিত্তিমূলে গড়ে উঠলে যাবতীয় অন্যায়ের পথ রুদ্ধ হবে। এ মর্মে আল্লাহ তা'আলা বলেন, যাদের মাঝে ৪টি গুণ যথা- ঈমান, 'আমল, হক্বের দা'ওয়াত ও হক্বের প্রতি সবর থাকবে, তারা ব্যতীত সব মানুষই ক্ষতির মধ্যে নিমজ্জিত।

আজ বাস্তবতা দৃষ্টে মনে হচ্ছে আমরা সেই ক্ষতির সম্মুখীন। মতের ভিন্নতা থাকতে পারে; কিন্তু মতানৈক্য ইসলাম কোনোভাবে সমর্থন করে না। দেশ ও জাতির কল্যাণে পরস্পর সহমর্মী হতে হবে। একে অন্যের মতের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে বৃহত্তর কল্যাণের লক্ষ্যে মৌলিক বিষয়ে ঐক্যমত হওয়ার মাঝেই জাতির মঙ্গল নিহিত। দ্বন্দ্ব সংঘাত কক্ষনই কোনো শান্তিকামী মানুষের কাম্য হতে পারে না।

যখন কোনো জনপদে যুদ্ধ লাগে, তখন ঐ জনপদের সর্বত্র বিপর্যয় দেখা দেয়। ভালো-মন্দ ও জাত-পাতের ভেদাভেদ করে না। অতএব সংঘাত নয়; শান্তি চাই। মহান আল্লাহর চেয়ে কে চরম সত্যবাদী(?) নিশ্চয়ই মহান আল্লাহর কথা চূড়ান্ত। আজ মানুষ যদি তার নির্দেশনা মানতো, তাহলে তারা মহান আল্লাহর গোলামীর অধিন প্রকৃত স্বাধীনতার সুখ উপভোগ করতে পারতো। সমাজে কোনো প্রকার বিশৃঙ্খলা ও বিপর্যয় দেখা দিতো না। কিন্তু কম মানুষই উপদেশ গ্রহণ করে থাকো। হায়! আমরা যদি সঠিক উপদেশ গ্রহণকারী হতাম। ❑

আল কুরআনুল হাকীম

অন্যায় হত্যাযজ্ঞ মানব সভ্যতা ধ্বংসের নামান্তর

–আবু আদেল মুহাম্মাদ হারুন হুসাইন*

আল্লাহ তা'আলার বাণী

﴿مِنْ أَجْلِ ذٰلِكَ كَتَبْنَا عَلٰى بَنِيْ إِسْرَائِيْلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيْعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيْعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيْرًا مِنْهُمْ بَعْدَ ذٰلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُوْنَ﴾

সরল বাংলায় অনুবাদ

"এ কারণে আমি বানী ইসরা-ঈলদের প্রতি (অবধারিত বিধানরূপে) লিখে দিয়েছি যে, কোনো প্রাণের বদলে প্রাণ ছাড়া কিংবা নিছক ফাসাদ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে যে কাউকে হত্যা করে সে যেন সমস্ত মানুষকেই হত্যা করে। আর যে ব্যক্তি কারো জীবন রক্ষা করে, সে যেন সবার জীবন রক্ষা করে। নিশ্চয়ই তাদের কাছে আমার রাসূলেরা নিদর্শনাবলী নিয়ে এসেছেন। বস্তুতঃ এরপরও তাদের অধিকাংশ লোক যমীনে ফাসাদ সৃষ্টি করে।"[১]

আয়াতের বিষয়বস্তু

মানুষ একটি জাতিসত্ত্বার নাম। এর হিফাযত বা সংরক্ষণ আবশ্যক। অনর্থক ফাসাদ বা বিপর্যয় সৃষ্টি বড় গর্হিত কাজ। এটি পুরো মানব সভ্যতা ধ্বংসের নামান্তর। আলোচ্য আয়াতে সে কথাই বিধৃত হয়েছে।

ঘটনার প্রেক্ষাপট

পৃথিবীতে সর্বপ্রথম মানুষ হত্যার ন্যায় জঘন্য আপরাধ সংঘটিত করে আদম (আলাইহিস সালাম)-এর পুত্র ক্বাবিল। সে ঈর্ষাপরায়ণ হয়ে তার ভাই হাবিলকে হত্যা করে। এ সময় অত্যাচারের শিকার হাবিল মহান আল্লাহর ভয় এবং হত্যার অশুভ পরিণাম ভেবে ভীত ছিল। কিন্তু ক্বাবিল তার ক্রোধ নিয়ন্ত্রণ করতে পারেনি। ফলে সে অন্যায় করে বসে এবং আপন ভ্রাতা হাবিলকে নির্মমভাবে হত্যা করে। অতঃপর সে তার নিহত ভাইকে কোথায় কিভাবে দাফন করবে, তার দিশা না পেয়ে ভীষণ লজ্জায় পড়ে। এ লজ্জার কারণ ভাই হত্যার জন্য অনুশোচনা নয়; বরং দাফনের বিধান না জানার বিড়ম্বনা মাত্র। সে কারণে ক্বাবিল ক্ষমা পায়নি। আর তার এ ঘৃন্য অপরাধ তাকে দুনিয়া ও আখিরাত উভয় জগতে ক্ষতিগ্রস্ত করে।[২]

প্রাসঙ্গিক জ্ঞাতব্য

আয়াতে উল্লেখিত হয়েছে যে, একজন মানুষ হত্যা যেন গোটা মানব সভ্যতাকে হত্যা করার সমান। এ বিধান জারির সাথে আল্লাহ তা'আলা বানী ইসরা-ঈলকে বিশেষায়িত করেছেন। যদিও ঘটনাটি অনেক পূর্বেকার। প্রশ্ন হলো– এখানে কেন বানী ইসরা-ঈলকে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হলো? এর উত্তরে তাফসীর বিশারদগণ বলেছেন : বানী ইসরা-ঈল-এর পূর্বেকার জাতির উপরও মানুষ হত্যা হারাম ছিল। কিন্তু সে আদেশ ছিল অলিখিত। পরবর্তীতে বানী ইসরা-ঈল মানুষ হত্যায় সীমালঙ্ঘন করার কারণে তাদের উপর প্রথম লিখিত নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়। এ কারণেই তাদের নাম উল্লেখিত হয়েছে।[৩]

বিধানটির কার্যকারিতা প্রসঙ্গ

এটি বানী ইসরা-ঈলের প্রতি লিখিত বিধান হলেও আল্লাহ তা'আলা তা আমাদের জন্য প্রেরিত তাঁর

---

* *সম্পাদক, সাপ্তাহিক আরাফাত। সিনিয়র যুগ্ম সেক্রেটারি জেনারেল, বাংলাদেশ জমঈয়তে আহ্লে হাদীস।*

[১] *সূরা আল মায়িদাহ্ : ৩২।*

[২] *ড. ওয়াহবা আয-যুহায়লী 'আত্ তাফসীর আল-মুনীর' দারুল ফিক্র-দামেস্ক- ৩/৫০৯-৫১০, মাওলানা মহিউদ্দিন খাঁন অনূদিত 'পবিত্র কুরআনুল কারীম'-বাদশা ফাহাদ কুরআন মুদ্রণ প্রকল্প- মাদীনাহ্/৩২৪।*

[৩] *ইমাম ইবনু কাসীর 'তাফসীরুল কুরআনিল কারীম'- ৩/৯৩, ইমাম ইবনু জারীর 'তাফসীর আত্ তাবারী'- ১০/২৩১, ড. ওয়াহবা আয-যুহায়লী 'আত্ তাফসীর আল-মুনীর' দারুল ফিক্র- দামেস্ক- ৩/৫১০।*

সর্বশেষ ও চূড়ান্ত আসমানী গ্রন্থ আল কুরআনে উল্লেখ করেছেন। আর ইসলামের নীতি হলো– পূর্ববর্তী বিধান যা কুরআন ও সুন্নাহ সমর্থন করে, তা এ উম্মাতের জন্য বলবৎ থাকে। কাজেই এটি যুগ পরম্পরায় চলে আসা মহান আল্লাহর অমোঘ বিধান। মানুষ বিচ্ছিন্ন কেউ নয়; বরং এটি একটি জাতিসত্তা বা সভ্যতার নাম। তাই এ মানব সভ্যতা সংরক্ষণের মহান লক্ষ্যে মানুষ হত্যাকে আল্লাহ তা'আলা কুফ্‌রী, গর্হিত ও সভ্যতার ধ্বংস বলে আখ্যা দিয়েছেন।

ইসলামে মানুষ হত্যা

ইসলামে মানুষ হত্যা কুফ্‌রী। প্রিয় নবী (ﷺ) বলেন :

سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوْقٌ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ.

"কোনো মুসলিমকে গালি দেয়া ফাসেক্বী কাজ এবং তাকে হত্যা করা কুফ্‌রী।"[৪] আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِيْ حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ﴾

"আল্লাহ যে প্রাণ হত্যা হারাম করেছেন, তা হত্যা করো না। তবে হকভাবে।"[৫]

অর্থাৎ- কুরআন ও সহীহ সুন্নাহ নির্দেশিত বিধানে হত্যাযোগ্য হলে কেবল রাষ্ট্র বা সরকার তা কার্যকর করবে; কোনো অবস্থাতে আইন নিজের হাতে তুলে নেয়া যাবে না। আল্লাহ তা'আলা স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, মানুষ হত্যার পরিণাম জাহান্নাম। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿وَلَا تَقْتُلُوْا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ۞ وَمَنْ يَفْعَلْ ذٰلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيْهِ نَارًا...﴾

"তোমরা নিজেদেরকে হত্যা করো না, নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের প্রতি অতিশয় মেহেরবান। আর যে ব্যক্তি সীমালঙ্ঘন বা যুল্‌মের বশবর্তী হয়ে এরূপ (হত্যা) করবে, তাকে দ্রুত (জাহান্নামের) আগুনে পৌঁছে দেয়া হবে...।"[৬]

প্রিয় নবী (ﷺ) বলেন :

كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ، دَمُهُ، وَمَالُهُ، وَعِرْضُهُ.

"প্রত্যেক মুসলিমের উপর অপর মুসলিমের রক্ত, সম্পদ ও সম্মান হারাম।"[৭]

উপরোক্ত দলিল দ্বারা একথা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত যে, মানুষ হত্যা মহাপাপ। আর সমাজে বিপর্যয় সৃষ্টি করাও তেমনি হারাম ও গর্হিত কাজ। ইসলাম সর্বতঃভাবে এটা নিষেধ করেছে। শুধু নিষেধই করেনি; বরং এ ধরনের হত্যাকারীকে সমাজচ্যুত বলে আখ্যা দিয়েছে। প্রিয় নবী (ﷺ) বলেন :

«مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا».

"যে ব্যক্তি আমাদের উপর অস্ত্র উত্তোলন করবে, সে আমার উম্মাতভুক্ত নয়।"[৮]

পরিশেষে বলা যায়– প্রতিহিংসা পরায়ণতা থেকে হত্যার ন্যায় গুরুতর অপরাধ সংঘটিত হয়। আর ইসলাম পরস্পর হিংসা-বিদ্বেষকে খুবই নিন্দনীয় অপরাধ হিসেবে আখ্যা দিয়ে আমাদেরকে এহেন কাজ হতে সতর্ক ও সাবধান করেছে।

দারসের শিক্ষাসমূহ

০১. হিংসা-বিদ্বেষ হত্যার ন্যায় গুরুতর অপরাধ ঘটাতে উৎসাহ যোগায়। যেমনটি করেছিল আদম (আলাইহিস্ সালাম)-এর পুত্র ক্বাবিল। আর এটি ছিল মানব ইতিহাসে প্রথম হত্যা।

০২. কোনো সীমালঙ্ঘনকারীর পরিণতি কখনও ভালো হয় না। যেমন- বানী ইসরা-ঈল ও তার দোসররা। বর্তমানেও যারা পৃথিবীতে অনর্থক বিপর্যয় সৃষ্টি করে চলেছে। তাদের পরিণতিও ভালো হবার নয়।

০৩. একজন মানুষ একটি সভ্যতার প্রতিবিম্ব। তাই একজন মানুষ হত্যা মানে পুরো মানব সভ্যতাকে হত্যা করা।

০৪. নিরাপদ ও শান্ত সমাজে ফাসাদ সৃষ্টিকারী ইসলামের দৃষ্টিতে সমাজচ্যুত। সে দুনিয়া ও আখিরাত উভয়ই হারায়।

০৫. অপরের যান ও মালের নিরাপত্তা দেয়া প্রতিটি মুসলিমের ঈমানী দায়িত্ব। নিজে নিরাপদ থাকি এবং অপরকে নিরাপদ থাকতে দেই। ❑

[৪] *সহীহুল বুখারী- হা. ৪৮, সহীহ মুসলিম- হা. ১১৬।*
[৫] *সূরা বানী ইসরা-ঈল : ১৭।*
[৬] *সূরা আন্ নিসা : ২৯ ও ৩০।*
[৭] *সহীহ মুসলিম- হা. ২৫৬৪, সুনান আবূ দাউদ- হা. ৪৮৮২, সুনান ইবনু মাজাহ্- হা. ৩৯৩৩।*
[৮] *সহীহুল বুখারী- হা. ৬৮৭৪ ও সহীহ মুসলিম- হা. ৯৮।*

হাদীসে রাসূল ﷺ

মহান আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা

–আবূ তাহসীন মুহাম্মদ

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অমিয় বাণী

وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ : وَاللهِ اِنِّىْ لَاَسْتَغْفِرُ اللهَ وَاَتُوْبُ اِلَيْهِ فِى الْيَوْمِ اَكْثَرَ مِنْ سَبْعِيْنَ مَرَّةً.

সরল অনুবাদ

আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে বলতে শুনেছি– আল্লাহর কসম! আমি প্রতিদিন সত্তরবারের বেশি মহান আল্লাহর নিকট ক্ষমা চাই ও তাওবাহ্ করি।[৯]

রাবীর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

নাম ও পরিচিতি : আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)'র নামের ব্যাপারে অনেক অভিমত পাওয়া যায়। প্রসিদ্ধ মত অনুযায়ী ইসলাম গ্রহণের পূর্বে তাঁর নাম ছিল আব্দুশ্ শামস বা আবদে 'উমার। ইসলাম গ্রহণের পর তাঁর নাম রাখা হয় 'আব্দুর রহমান। তিনি দক্ষিণ আরবের আযদ গোত্রের সুলায়ম ইবনু ফাহাম বংশোদ্ভূত ছিলেন। তাঁর পিতার নাম সাখর এবং মাতার নাম উম্মিয়া বিনতু সফীহ মতান্তরে মায়মুনাহ্।

আবূ হুরাইরাহ্ নামে নামকরণ : একদিন আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) জামার আস্তিনের নিচে একটি বিড়াল ছানা নিয়ে রাসূল (ﷺ)-এর দরবারে উপস্থিত হন। বিড়ালটি হঠাৎ সকলের সামনে বেরিয়ে পড়ল। এ অবস্থা দেখে রাসূল (ﷺ) তাঁকে রসিকতা করে– 'হে বিড়ালের পিতা'! বলে সম্বোধন করলেন। এরপর থেকে তিনি আবূ হুরাইরাহ্ নামে খ্যাতি লাভ করেন।

ইসলাম গ্রহণ : তিনি ৬২৯ খ্রিষ্টাব্দ মোতাবেক ৭ম হিজরিতে মুহার্‌রম মাসে খায়বর যুদ্ধের প্রাক্কালে মদীনায় ইসলাম গ্রহণ করেন। তখন তাঁর বয়স হয়েছিল ত্রিশ বছরের মতো।

যুদ্ধে অংশগ্রহণ : ইসলাম গ্রহণের পর হতে তিনি ইসলামের সকল যুদ্ধে রাসূল (ﷺ)-এর সাথে অংশ গ্রহণ করেন।

হাদীস শাস্ত্রে তাঁর অবদান : সাহাবীদের মাঝে তিনিই সর্বাধিক হাদীস বর্ণনা করেন। তাঁর বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা মোট ৫৩৭৪টি মতান্তরে ৫৩৭৫টি। ইমাম বুখারীর মতে, আট শতাধিক রাবী তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি আসহাবে সুফ্ফা-এর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

মৃত্যু : তিনি ৫৭ মতান্তরে ৫৮/৫৯ হিজরিতে ইন্তেকাল করেন। তাকে জান্নাতুল বাকীতে দাফন করা হয়।

ইস্তিগফারের গুরুত্ব ও ফযীলত

ইস্তিগফার অর্থ ক্ষমা প্রার্থনা করা, ক্ষমা চাওয়া। মানুষ স্বভাবতই পাপ করে থাকে। এই পাপ মোচনের জন্য মহান রাব্বুল 'আলামীনের কাছে যে ক্ষমা প্রার্থনা করা হয় তাকেই বলা হয় ইস্তিগফার। আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন সকল শ্রেণীর মানুষকে লক্ষ্য করে বলেন,

﴿وَاسْتَغْفِرُوْا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوْبُوْا إِلَيْهِ﴾

অর্থ : "তোমরা তোমাদের প্রভুর সকাশে ইস্তিগফার করো। অতঃপর তার দিকে প্রত্যাবর্তন (তাওবাহ্) করো।"[১০]

এই আয়াতকে মাইলফলক বানিয়ে আল্লামা আলুসী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, ইস্তিগফার অর্থ অতীতের গুনাহসমূহের ব্যাপারে ক্ষমা প্রার্থনা করা বা ক্ষমা চাওয়া। আর তাওবার উদ্দেশ্য হলো অন্তরে লজ্জিত ও অনুতপ্ত হওয়ার সাথে সাথে ভবিষ্যতে এরূপ গুনাহ দ্বিতীয়বার না করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করা। ইস্তিগফার অর্থ হচ্ছে গুনাহকে মিটিয়ে দেয়ার কামনা করা। আর তাওবার অর্থ হচ্ছে পূর্বের কৃতকর্মের উপর লজ্জিত হয়ে ভবিষ্যতে আর গুনাহের কাজ না করার দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হওয়া। তাওবাহ্ খাস নিজের জন্য। আর ইস্তিগফার সকলের জন্য 'আম।

[৯] *বুখারী- হা. ৬৩০৭; আত্ তিরমিযী- হা. ৩২৫৯; ইবনু মাজাহ্- হা. ৩৮৬১; আহমাদ- হা. ৭৭৩৪, ৮২৮৮, ৯৫১৫।*

[১০] *সূরা হূদ : ৯০।*

ইস্তিগফার সব সময় সকল অবস্থায় সকল শ্রেণীর মানুষের জন্য প্রযোজ্য। উপর্যুক্ত বর্ণনাসমূহের দ্বারা এটাই প্রমাণিত হয় যে, তাওবাহ্ ও ইস্তিগফার মূলত এক বিষয় নয়; বরং উভয়ের মাঝে কিছু পার্থক্য রয়েছে। কেননা যদি দু'টোর মাঝে কোনো পার্থক্য না থাকতো, তাহলে রাব্বুল 'আলামীন উভয়টা একসাথে বর্ণনা করতেন না।

সুতরাং তাওবার হাকিকত হলো লজ্জা ও চিন্তার মাধ্যমে ইস্তিগফার করা। ইমাম গাযালী (রাহিমাহুল্লাহ) তাওবার নিমিত্তে বিনয়ের সাথে ক্রন্দনরত চিত্তে নিজেকে হেয় মনে করে দু'রাকআত নামায পরে কান্না-কাটি করে ক্ষমা চাওয়ার কথা বলেছেন। সিজদায় অনেক্ষণ যাবত কেঁদে মাফ নেয়ার কথা তিনি উল্লেখ করেছেন। সাথে সাথে এ কামনা করতে হবে যে মহান আল্লাহর দরবার ব্যতীত আর কোথাও এমন জায়গা নেই যেখানে মাফ পাওয়া যাবে।

আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন তাঁরই রাসূল (ﷺ)-কে তাওবাহ্ ও ক্ষমা প্রার্থনা করার নির্দেশ দিয়েছেন নিম্নোক্ত আয়াতে।

﴿فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا﴾

অর্থ : "অতএব হে নবী! আপনি আপনার প্রভুর প্রশংসাসহ তাঁর তাসবীহ করুন এবং তার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করুন। নিশ্চয়ই তিনি তাওবাহ্ কবুলকারী।"[১১] ইস্তিগফার বা ক্ষমা চাওয়ার নির্দেশ ও তার ফযীলত সম্পর্কে আল্লাহ বলেন,

﴿وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ﴾

"হে রাসূল! তুমি নিজের এবং মু'মিন নারী ও পুরুষের জন্য ক্ষমা চাও।"[১২] আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَاسْتَغْفِرِ اللهَ إِنَّ اللهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا﴾

"আল্লাহর নিকট ক্ষমা চাও। অবশ্যই আল্লাহ অত্যন্ত ক্ষমাশীল ও দয়াবান।"[১৩] আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿وَمَنْ يَّعْمَلْ سُوْٓءًا اَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهٗ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللّٰهَ يَجِدِ اللّٰهَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا﴾

"যদি কেউ কোনো রকম অন্যায় কাজ করে অথবা নিজের উপর অত্যাচার করে, অতঃপর আল্লাহর নিকট ক্ষমা চায়, তবে আল্লাহকে সে ক্ষমাকারী ও অনুগ্রহশীল পাবে।"[১৪]

﴿وَمَا كَانَ اللهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَاَنْتَ فِيْهِمْ وَمَا كَانَ اللهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُوْنَ﴾

"আল্লাহ এমন নন যে, তুমি তাদের মাঝে অবস্থান করতেই তাদের উপর শাস্তি অবতীর্ণ করবেন। এটাও আল্লাহর নিয়ম নয় যে, লোকেরা মাফ চাইবে, আর তিনি তাদেরকে 'আযাব দিবেন।"[১৫]

﴿وَالَّذِيْنَ اِذَا فَعَلُوْا فَاحِشَةً اَوْ ظَلَمُوْٓا اَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللّٰهَ فَاسْتَغْفَرُوْا لِذُنُوْبِهِمْ وَمَنْ يَّغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا اللّٰهُ وَلَمْ يُصِرُّوْا عَلٰى مَا فَعَلُوْا وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ﴾

"তাদের মাধ্যমে কোনো অন্যায় কাজ হয়ে গেলে কিংবা নিজেদের উপর কোনো অন্যায় করে বসলে তারা সাথে সাথে আল্লাহর কথা মনে করে এবং তাঁর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে। আর আল্লাহ ব্যতীত গুনাহ ক্ষমা করতে পারে এমন কে আছে? সজ্ঞানে এইসব ব্যক্তি বারবার অন্যায় কাজ করে না।"[১৬] মহান আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করার গুরুত্ব সম্পর্কে হাদীসে এসেছে–

وَعَنْ الْاَغَرِّ الْمُزَنِيِّ : اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ : اِنَّهُ لَيُغَانُ عَلٰى قَلْبِيْ وَاِنِّيْ لَاَسْتَغْفِرُ اللهَ فِي الْيَوْمِ مِئَةَ مَرَّةٍ.

আল-আগার আল-মুযানী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন : (কোনো কোনো সময়) আমার মনের উপর আস্তরণ পড়ে যায়। মহান আল্লাহর নিকট আমি প্রতিদিন একশত বার তাওবাহ্ করি।[১৭]

---

[১১] *সূরা আন্ নাস্র : ৩।*
[১২] *সূরা মুহাম্মাদ : ১৯।*
[১৩] *সূরা আন্ নিসা : ১০৬।*
[১৪] *সূরা আন্ নিসা : ১১০।*
[১৫] *সূরা আল আনফাল : ৩৩।*
[১৬] *সূরা আ-লি 'ইমরান : ১৩৫।*
[১৭] *সহীহ মুসলিম- হা. ২৭০২; সুনান আবূ দাউদ- হা. ১৫১৫; মুসনাদ আহমাদ- হা. ১৭৩৯১, ১৭৮২৭।*

وَعَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ لَوْ لَمْ تُذْنِبُوْا لَذَهَبَ اللهُ تَعَالَى بِكُمْ وَلَجَاءَ بِقَوْمٍ يُذْنِبُوْنَ فَيَسْتَغْفِرُوْنَ اللهَ تَعَالَى فَيَغْفِرُ لَهُمْ.

আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন : যাঁর হাতে আমার জীবন সেই মহান সত্তার কসম! যদি তোমরা অপরাধ না করতে, তোমাদেরকে আল্লাহ সরিয়ে নিতেন, অতঃপর এমন এক জাতিকে পাঠাতেন যারা অপরাধ করে আল্লাহ তা'আলার নিকট মাফ চাইতো এবং তিনি তাদেরকে মাফ করে দিতেন।[১৮]

এ হাদীস দ্বারা পাপ করার পর মহান আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করার গুরুত্ব ব্যক্ত করা হয়েছে। পাপ করার জন্য উৎসাহ দেওয়া হয়নি। কেননা, মানুষ মাত্রই ভুলে জড়িত। তাই ভুলে জড়িত হয়ে পড়লে আবশ্যিকরূপে ক্ষমা চাওয়া কর্তব্য।

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) প্রতিদিন শতবার তাওবাহ্ করতেন

আল্লাহর রাসূল (ﷺ) বার বার সাহাবীগণকে মহান আল্লাহর কাছে তাওবাহ্ ও ইস্তেগফার করার নির্দেশ প্রদান করতেন। তিনি বলেন,

«يَا أَيُّهَا النَّاسُ تُوْبُوْا إِلَى اللهِ وَاسْتَغْفِرُوْهُ فَإِنِّيْ أَتُوْبُ فِي الْيَوْمِ مِائَةَ مَرَّةٍ».

অর্থ : হে লোক সকল! তোমরা মহান আল্লাহর কাছে তাওবাহ্ করো এবং তাঁর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করো। কেননা আমি দৈনিক শতবার তাওবাহ্ করি।[১৯]

ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণনা করেন রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন যে ব্যক্তি নিয়মিত ইস্তিগফার (ক্ষমা প্রার্থনা) করে, অর্থাৎ- أَسْتَغْفِرُ الله বলে, আল্লাহ তা'আলা তার জন্য প্রতিটি সমস্যা থেকে বেরিয়ে আসার পথ খুলে দেন, প্রতিটি দুশ্চিন্তা থেকে তাকে মুক্তি দেন এবং তাকে এমন উৎস (সোর্স) থেকে জীবিকা দেন যা সে কল্পনাও করেনি।[২০]

মকবুল ইস্তিগফার

মহাগ্রন্থ আল কুরআনে ৩টি মকবুল (গৃহীত) ইস্তিগফারের বিবরণ পাওয়া যায়। একটি হলো– আদম (আলাইহিস সালাম) ও হাওয়া (আলাইহাস সালাম)-এর তাওবাহ্ ও ইস্তিগফার। তারা মহান আল্লাহর হুকুম অমান্য করে যে অপরাধ করেছিলেন তার জন্যে এভাবে মহান আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেন–

﴿رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِنْ لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الْخَاسِرِيْنَ﴾

অর্থ : "হে আমাদের প্রভু! আমরা আমাদেরই প্রতি যুল্‌ম (অন্যায়) করেছি। এখন তুমি যদি আমাদের ক্ষমা না করো এবং আমাদের প্রতি দয়া না করো তাহলে তো আমরা ভীষণ ক্ষতিতে নিমজ্জিত হবো।"[২১]

এভাবে ইউনুস (আলাইহিস সালাম)-ও তাওবাহ্ ইস্তিগফার করেছিলেন। তিনি মহান আল্লাহর অনুমতি ছাড়া নিরাশ হয়ে নিজের অবাধ্য কৃওমকে সংশোধন করার কাজ ত্যাগ করে চলে যাচ্ছিলেন। উপসাগর পার হবার সময় একটি মাছ তাঁকে খেয়ে ফেলে। মাছের পেটে থেকেই নিজের জন্য নিম্নোক্ত ভাষায় ক্ষমা প্রার্থনা করেন। আল্লাহ পাক তার প্রার্থনা কবুল করেন–

﴿لَّا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّيْ كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِيْنَ﴾

অর্থ : "হে আল্লাহ! তুমি ছাড়া কোনো ইলাহ (উদ্ধারকারী ও মুক্তিদাতা) নেই। তুমি অতিশয় পবিত্র, আমি যালিম (অন্যায়কারী)।"[২২]

মূসা (আলাইহিস সালাম) যুবক বয়সে ফিরাউনের পরিবারে থাকাকালীন এক বানী ইসরা-ঈলীর অভিযোগের প্রেক্ষিতে এক মিশরীয় কিবতিকে সতর্ক করার জন্যে থাপ্পর মারেন। কিন্তু ঐ থাপ্পরে কিবতি লোকটি মারা যায়। এই থাপ্পরের জন্য মূসা (আলাইহিস সালাম) সাথে সাথে মহান আল্লাহর কাছে এইভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করেন এবং আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন তাকে ক্ষমা করে দেন।

﴿رَبِّ إِنِّيْ ظَلَمْتُ نَفْسِيْ فَاغْفِرْ لِيْ﴾

অর্থ : "হে প্রভু! হে আল্লাহ! আমি আমার নিজের প্রতি যুল্‌ম করেছি। তুমি আমাকে ক্ষমা করে দাও।"[২৩]

---

[১৮] *সহীহ মুসলিম- হা. ২৭৪৯; জামে' আত্ তিরমিযী- হা. ২৫২৬; মুসনাদ আহমাদ- হা. ৭৯৮৩, ৮০২১।*

[১৯] *মুসলিম- হা. ৪১/২৭০২; মুসনাদ আহমাদ- হা. ১৮২৯৩।*

[২০] *মুসনাদ আহমাদ; সুনান আবূ দাউদ; সুনান ইবনু মাজাহ্।*

[২১] *সূরা আল আ'রাফ : ২৩।*

[২২] *সূরা আল আম্বিয়া- : ৮৭।*

[২৩] *সূরা আল ক্বাসাস : ১৬।*

আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন– ‘প্রতিটি আদম সন্তানই পাপী। আর উত্তম পাপী হলো তারা, যারা তাওবাহ্ (অনুতপ্ত হয়ে ক্ষমা প্রার্থনা) করে।’[২৪]

সাইয়্যেদুল ইস্তিগফার অর্থাৎ- তাওবার সর্বশ্রেষ্ঠ দু‘আ ও তার ফযিলত

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তার সাহাবীদেরকে বলেছেন, আমি তোমাদেরকে এমন একটি দু‘আ শিক্ষা দিচ্ছি যে, কেউ বিশ্বাস ও আস্থা নিয়ে সন্ধ্যায় এই দু‘আ পাঠ করলে রাত্রেই যদি তার মৃত্যু ঘটে তবে সে জান্নাতী হবে এবং কেউ যদি সকালে বিশ্বাস ও আস্থার সাথে এই দু‘আ পড়ে এবং সন্ধ্যার পূর্বে মারা যায় তাহলে সে জান্নাতী হবে।[২৫]

সর্বোত্তম ইস্তিগফার হলো– সাইয়্যিদুল ইস্তিগফার। আর তা হলো–

"اَللّٰهُمَّ أَنْتَ رَبِّيْ، لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ، خَلَقْتَنِيْ وَأَنَا عَبْدُكَ، وَأَنَا عَلٰى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، أَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ، أَبُوْءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ وَأَبُوْءُ بِذَنْبِيْ، اغْفِرْ لِيْ، فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ إِلَّا أَنْتَ".

হে আল্লাহ! তুমিই আমার পালনকর্তা। তুমি ব্যতীত আর কোনো মা‘বূদ নেই। তুমি আমাকে সৃষ্টি করেছ। আমি তোমার গোলাম। আমি যথাসাধ্য তোমার সাথে কৃত ওয়াদা-অঙ্গীকারের উপর দৃঢ় থাকব। আমার কৃতকর্মের কুফল ও মন্দ পরিণাম থেকে তোমার নিকট মুক্তি চাই। তুমি আমাকে যেসব নিয়ামত দিয়েছ আমি সেসব নিয়ামতের কথা স্বীকার করছি আর স্বীকার করছি আমার গুনাহের কথাও। তুমি আমাকে ক্ষমা কর। কেননা, তুমি ছাড়া গুনাহ ক্ষমা করার আর কেউ নেই।[২৬]

হাসান বসরী মহান আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনার ব্যাপারে মানুষদের নসিহত করতেন। একদিনের ঘটনা হাসান বসরী (রহিমাহুল্লাহ-হ) মজলিসে বসা ছিলেন।

একজন লোক এসে বললেন, জনাব! আমি জীবনে অনেক গুনাহ করেছি, কীভাবে আমার জীবনের সব গুনাহ মাফ করাতে পারবো?

তিনি বললেন, “যাও এবং ইস্তিগফার (মহান আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা) করো।”

একজন লোক এসে বলল, অনেকদিন ধরে বৃষ্টি হচ্ছে না, এমন কোনো ‘আমল বলে দিন যা করলে আল্লাহ তা‘আলা বৃষ্টি দিবেন। তিনি বললেন, “যাও এবং ইস্তিগফার করো।”

একজন লোক এসে বলল, আমি ঋণে জর্জরিত। আমি কাজ করছি, আপনি মহান আল্লাহর কাছে দু‘আ করুন যেন তিনি আমাকে সম্পদ দান করেন এবং আমি ঋণমুক্ত হতে পারি।

তিনি বললেন, “যাও এবং ইস্তিগফার করো।”

একজন লোক এসে বলল, আমি চাই আল্লাহ তা‘আলা যেন আমাকে সন্তান দান করেন। আপনি দু‘আ করুন।

তিনি বললেন, “যাও এবং ইস্তিগফার করো।”

একজন লোক এসে বলল আমার একটি বাগান আছে। আপনি দু‘আ করুন যেন আমার বাগানে আল্লাহ তা‘আলা ফল বেশি করে দেন।

তিনি বললেন, “যাও এবং ইস্তিগফার করো।”

একজন লোক এসে বলল, আমার ঘরে যদি পানি থাকতো তাহলে খুব ভালো হতো।

তিনি বললেন, “যাও এবং ইস্তিগফার করো।”

হাসান বসরী (রহিমাহুল্লাহ-হ)-এর এক ছাত্র পাশেই বসা ছিলেন। তিনি এসব দেখে চিন্তা করতে লাগলেন, “কেন সবাইকেই বিভিন্ন সমস্যার একই সমাধান বলছেন?!”

ছাত্রটি হাসান বাসরী (রহিমাহুল্লাহ-হ)-কে জিজ্ঞেস করলেন, কেন আপনি সকল সমস্যার একটাই সমাধান দিচ্ছেন?

হাসান বাসরী (রহিমাহুল্লাহ-হ) মুচকি হেসে বললেন, কেন! তুমি কি আল্লাহ তা‘আলার এই বাণী পড়নি?

﴿فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوْا رَبَّكُمْ ۚ اِنَّهٗ كَانَ غَفَّارًا يُّرْسِلِ السَّمَآءَ عَلَيْكُمْ مِّدْرَارًا وَّيُمْدِدْكُمْ بِاَمْوَالٍ وَّبَنِيْنَ وَيَجْعَلْ لَّكُمْ جَنّٰتٍ وَّيَجْعَلْ لَّكُمْ اَنْهٰرًا﴾

অর্থ : “বলেছি– তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের ক্ষমা প্রার্থনা করো, তিনি তো অতিশয় ক্ষমাশীল; তিনি তোমাদের জন্যে আকাশ হতে প্রচুর বৃষ্টিপাত করবেন, তিনি তোমাদেরকে সমৃদ্ধ করবেন ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততিতে এবং তোমাদের জন্যে বাগানসমূহ তৈরি করবেন ও প্রবাহিত করবেন নদী-নালা।”[২৭]

মুসলিম আন্দালুসের (স্পেনের) সুপ্রসিদ্ধ মুফাস্সির ইমাম কুরতুবি (রহিমাহুল্লাহ-হ) তাঁর তাফসীর “আল জামি‘ লি-আহকামিল কুরআন” এ উক্ত ঘটনাটি বর্ণনা করেছেন।

---

[২৪] *জামে‘ আত্ তিরমিযী; সুনান ইবনু মাজাহ্।*
[২৫] *সহীহুল বুখারী।*
[২৬] *সহীহুল বুখারী- হা. ৬৩০৬।*
[২৭] *সূরা নূহ্ : ১০-১২।*

হাফিয ইবনু তাইমিয়্যাহ্ (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, "ইস্তিগফার (মহান আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা) হলো সবচেয়ে বড় নেককাজগুলোর অন্যতম; এর ব্যাপ্তি এতো বেশি যে, যখনই কেউ নিজের 'ইবাদত, কথা ও কাজে ত্রুটি খুঁজে পায় অথবা তার রিযিকে স্বল্পতা পায় কিংবা তার হৃদয় থাকে অশান্ত, তার উচিত তৎক্ষণাত ইস্তিগফারে লেগে যাওয়া।[২৮]

ইস্তিগফারের বাক্য

শুধু اَسْتَغْفِرُ الله (বেশি পরিমাণে বলতে থাকা)।

اَسْتَغْفِرُ اللهَ الْعَظِيْمَ الَّذِىْ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَىُّ الْقَيُّوْمُ وَاَتُوْبُ اِلَيْهِ.

'আমি মহান আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি। যিনি ছাড়া 'ইবাদতের যোগ্য কোনো মা'বূদ নেই। তিনি চিরঞ্জীব ও চিরস্থায়ী, আর আমি তাঁরই কাছে তাওবাহ্ করছি। আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দিবেন যদিও যুদ্ধ ক্ষেত্র থেকে পলায়নকারী হয়।'[২৯]

وَاَتُوْبُ اِلَيْهِ اَسْتَغْفِرُ اللهَ.

'আমি মহান আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি। আর আমি তাঁরই কাছে তাওবাহ্ করছি।'

'আব্দুল্লাহ ইবনু 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণনা করেন– আমরা সমাবেশে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর ইস্তিগফার ও তাওবাহ্ শতবার পর্যন্ত গণনা করতাম। তিনি বলতেন–

«رَبِّ اغْفِرْ لِيْ وَتُبْ عَلَيَّ، إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الغَفُوْرُ».

অর্থ : হে আমার প্রভু! আমাকে ক্ষমা করে দাও এবং আমার তাওবাহ্ কবুল করো। নিশ্চয়ই তুমি ক্ষমাশীল ও তাওবাহ্ কবুলকারী।[৩০]

উপসংহার

'ইস্তিগফার' হলো– কৃত পাপকর্মের জন্য মহান আল্লাহর দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করা। মহান আল্লাহর অসংখ্য গুণাবলীর একটি হলো– ক্ষমা। আল্লাহ তা'আলা 'গাফুরুর রাহিম' অর্থাৎ- তিনি পরম ক্ষমাশীল, অতিশয় দয়ালু। যদি কোনো বান্দা ভুলবশত অতি ঘোরতর গুনাহের কাজ করে এবং সে যদি কায়মনোবাক্যে সিজদায়রত হয়ে তাওবাহ্-ইস্তিগফার করে মহান আল্লাহর দরবারে ক্ষমা চায়, তাহলে আল্লাহ তা'আলা সেসব ঈমানদার লোকদের ক্ষমা করে দেন।

ইস্তিগফার আমাদের পরকালকে যেমন সমৃদ্ধ করতে পারে, আমাদের দুনিয়ার জীবনকেও সুন্দর করতে পারে। ক্ষমাপ্রার্থনা কেবলই পাপ থেকে মুক্তি নয়, ক্ষমাপ্রার্থনা আমাদের সংকট ও বিপদাপদ থেকেও মুক্তির হাতিয়ার। সহজ কথা, আল্লাহ তা'আলার কাছে ক্ষমা চেয়ে কেউ যদি নিজের পাপগুলো ক্ষমা করিয়ে নিতে পারে, চোখের পানি ফেলে কেউ যদি ক্ষমাপ্রাপ্ত হতে পারে, তবে স্বাভাবিকভাবেই সে মহান আল্লাহর প্রিয় বান্দায় পরিণত হবে। আর মহান আল্লাহর প্রিয় বান্দা যারা, তাঁর রহমত ও দয়া তাদেরকে দুনিয়া-আখিরাত সর্বত্র ঘিরে রাখবেই। তা-ই যদি হয়, তবে আর ভাবনা কীসের! প্রয়োজন কেবলই গুনাহের অভিশাপ থেকে মুক্তির।

ইস্তিগফারের সঙ্গে জড়িয়ে থাকা একটি শব্দ-তাওবাহ্। শব্দ দু'টি প্রায় সমার্থক। ইস্তিগফার অর্থ কৃত গুনাহের জন্যে মহান আল্লাহর কাছে অনুতাপ ও অনুশোচনার সঙ্গে ক্ষমা প্রার্থনা করা, আর তাওবাহ্ অর্থ ফিরে আসা, পাপের পথ ছেড়ে পুণ্যের পথে ফিরে আসা, মহান আল্লাহর অবাধ্যতা থেকে আনুগত্যের দিকে ফিরে আসা, ভুল পথ ছেড়ে মহান প্রতিপালকের দিকে ফিরে আসা। এ তাওবাহ্-ইস্তিগফার একজন মু'মিনের বড় গুণ। গুনাহের অভিশাপ থেকে নিজেকে পবিত্র করার হাতিয়ার। মানবীয় দুর্বলতার কারণেই আমরা শিকার হই শয়তানের কুমন্ত্রণার। আর তখন বিভিন্ন গুনাহের কাজে জড়িয়ে পড়ি। সে গুনাহ থেকে মুক্তির পথই হচ্ছে তাওবাহ্ ও ইস্তিগফার। ইচ্ছায় হোক কিংবা অনিচ্ছায়, মানুষ কোনো পাপে লিপ্ত হওয়ার পর যদি সে তার ভুল বুঝতে পারে এবং এজন্যে সে কায়মনোবাক্যে মহান প্রভূর কাছে অনুতপ্ত হয়, তাহলে সে গুনাহ যত বড়ই হোক না কেন, তা ক্ষমা করে দেওয়া হয়। ❑

দু'আর আবেদন

সাপ্তাহিক আরাফাতের বিপণন কর্মকর্তা মুহাম্মদ আব্দুল মুমিনের জ্যেষ্ঠ পুত্র মুহাম্মদ হাবিবুল্লাহ (১১) জন্মের পর থেকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আছে। সাপ্তাহিক আরাফাতের পাঠক-পাঠিকাসহ সকল মুসলিমকে তার আরগ্যের জন্য দু'আ করার অনুরোধ করা যাচ্ছে।

---

[২৮] *মাজমূউ ফাতাওয়া- ১১/৬৯৮।*

[২৯] *আবূ দাউদ- ২/৮৫; জামে' আত্ তিরমিযী- ৫/৫৬৯, ৩৯০।*

[৩০] *মুসনাদ আহমাদ- হা. ৪৭২৬; জামে' আত্ তিরমিযী- হা. ৩৪৩৪, সহীহ; সুনান আবূ দাউদ।*

প্রবন্ধ

নওয়াব সলিমুল্লাহ : বাংলায় নারী শিক্ষার অগ্রদূত

–আবু সা'দ ড. মো. ওসমান গনী★

বাংলার ইতিহাসে নবাব সলিমুল্লাহ একটি অবিস্মরণীয় নাম। আদর্শবান-ধর্মভীরু নওয়াব সলিমুল্লাহ মানুষের ইহ-পরলৌকিক কল্যাণ নিয়ে ভাবতেন। ভাবতেন, পৃথকভাবে নারীদের নিয়ে। তিনি নির্ণয় করেছিলেন নারী সমাজের উন্নয়নের চাবিকাঠি 'শিক্ষা'। আল কুরআনের ভাষার অনুকরণে তাঁরও প্রশ্ন ছিল, 'যারা জ্ঞানী এবং যারা জ্ঞানী নয় তারা কি সমান হতে পারে'?[৩১] আর 'যারা শিখে এবং শেখায় তারাইতো জ্ঞানী'। তিনি ঈমানদার ও জ্ঞানীদের উচ্চমর্যাদা সম্পর্কে সবিশেষ অবগত ছিলেন। কেননা, তিনি জেনে অনুপ্রাণীত হয়েছিলেন যে, 'তোমাদের মধ্যে যারা ঈমানদার ও যাদের জ্ঞান দান করা হয়েছে; আল্লাহ তাঁদের সুউচ্চ মর্যাদা দান করেন'।[৩২] সেই কারণে নওয়াব সলিমুল্লাহ জ্ঞানচর্চায় ব্রতী হওয়া অন্যতম কর্তব্য মনে করতেন।

নওয়াব সলিমুল্লাহ নিজেই ছিলেন জ্ঞানের আধার। জ্ঞান চর্চায় তার আসক্তি ছিল বিস্ময়কর। ছেলে বেলাতেই তিনি উর্দু, আরবি, ফার্সি ও ইংরেজি ভাষা আত্মস্থ করেছিলেন। জার্মানি ভাষাও। এসব ভাষায় অনর্গল কথা বলতে পারতেন। পড়তেন, লিখতেন। তিনি হৃদয়ের গহীন অঙ্গনের আন্তরিক বিবেচনায় অনুভব করেছিলেন সুনান ইবনু মাজাহ্ গ্রন্থে মুদ্রিত হাদীস : "প্রত্যেক মুসলিম নর-নারীর জন্য জ্ঞান অর্জন করা ফর্‌য।" স্রষ্টার প্রিয় হাবীব রাসূল (ﷺ)-এর অমীয়বাণী অনুধাবন করে নারী সমাজকে বেছে নিয়েছিলেন। অবলা-দুহিতাদের মনের মুকুরে খালেকের ভয় কীভাবে পৌঁছানো যায়– এটি ছিল তার লালিত ভাবনা। কারণ তিনি জেনেছিলেন, 'নিশ্চয় আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে জ্ঞানীরাই আল্লাহকে বেশি ভয় করে'।[৩৩]

পূর্ব বাংলা আসাম সরকার ১৯০৮ সালে ১৭ ফেব্রুয়ারী জনশিক্ষা বিভাগের পরিচালক রবার্ট নাথন-এর নেতৃত্বে নারী শিক্ষার জন্য গঠিত কমিটির সদস্য ছিলেন নওয়াব সলিমুল্লাহ। নারী শিক্ষা উন্নয়নে তাঁর উত্সর্জন ছিল অসামান্য। বিভিন্ন বক্তৃতায় তার প্রতিফলন ঘটে। তিনি আইন সভার ঐতিহাসিক ভাষণে, উচ্চারণ করেন– "Our Females are admittedly lamentably backward in this respect" তিনি সদাশয়

★ **ভাইস-প্রেসিডেন্ট,** বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস; **প্রফেসর ও ডিন, স্কুল অব আর্টস,** এশিয়ান ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ।

[৩১] আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿اَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ اٰنَآءَ الَّيْلِ سَاجِدًا وَّقَآئِمًا يَّحْذَرُ الْاٰخِرَةَ وَيَرْجُوْا رَحْمَةَ رَبِّهٖ ؕ قُلْ هَلْ يَسْتَوِى الَّذِيْنَ يَعْلَمُوْنَ وَالَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ ؕ اِنَّمَا يَتَذَكَّرُ اُولُوا الْاَلْبَابِ﴾

"যে ব্যক্তি রাতের বিভিন্ন সময়ে সাজদাহবনত হয়ে ও দাঁড়িয়ে আনুগত্য প্রকাশ করে, আখিরাতকে ভয় করে এবং তার রবের অনুগ্রহ প্রত্যাশা করে সে কি তার সমান যে তা করে না? বলো : যারা জানে এবং যারা জানে না তারা কি সমান? বোধশক্তি সম্পন্ন লোকেরাই শুধু উপদেশ গ্রহণ করে।" (সূরা আয্ যুমার : ৯)

[৩২] আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন :

﴿يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا قِيْلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوْا فِى الْمَجٰلِسِ فَافْسَحُوْا يَفْسَحِ اللّٰهُ لَكُمْ ۚ وَاِذَا قِيْلَ انْشُزُوْا فَانْشُزُوْا يَرْفَعِ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ ۙ وَالَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ دَرَجٰتٍ ؕ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ﴾

"হে মু'মিনগণ! যখন তোমাদের বলা হয় মজলিসের স্থান প্রশস্ত করে দাও, তখন তোমরা স্থান করে দিবে। আল্লাহ তোমাদের জন্য স্থান প্রশস্ত করে দিবেন এবং যখন বলা হয় উঠে যাও, তখন উঠে যাবে। তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে এবং যাদেরকে জ্ঞান দান করা হয়েছে আল্লাহ তাদেরকে মর্যাদায় উন্নত করবেন; আল্লাহ লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন, তোমরা যা করো সেই সম্পর্কে আল্লাহ সবিশেষ অবহিত।" (সূরা আল মুজা-দালাহ্ : ১১)

[৩৩] আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَآبِّ وَالْاَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ اَلْوَانُهٗ كَذٰلِكَ ؕ اِنَّمَا يَخْشَى اللّٰهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمٰٓؤُا ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ غَفُوْرٌ﴾

"এভাবে রং বেরংয়ের মানুষ, জানোয়ার ও চতুস্পদ জন্তু রয়েছে। আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে যারা জ্ঞানী তারাই তাঁকে ভয় করে; আল্লাহ পরাক্রমশালী, ক্ষমাশীল।" (সূরা ফা-ত্বির : ২৮)

গভর্ণমেন্টের এমনি উদ্যোগে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে বলেন– "We note with great satisfaction that government are taking special interest."[৩৪]

তিনি নারীদের মাঝে শিক্ষার আলো ছড়ানো অপরিহার্য মনে করতেন। কিন্তু কাজটি সুকঠিন তা তিনি বিলক্ষণ জানতেন। উক্ত কমিটির অধীনে গঠিত মুসলিম নারী-শিক্ষা বিষয়ক সাব-কমিটিতে নওয়াব সলিমুল্লাহ দায়িত্ব প্রাপ্ত হন। ইতিপূর্বে মুসলিম নারীদের শিক্ষা-উন্নয়নে কলকাতা কেন্দ্রিক শিক্ষা বিভাগের পরিচালক মি. এ. আর্ল-এর উদ্যোগে গঠিত কমিটি কর্তৃক বহুবিধ প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল। ১৯০৭ সালের ৫ মার্চ মাসে রাইটার্স বিল্ডিং-এ উপস্থাপিত মুসলিম নেতাদের উপস্থিতিতে মুসলিম বালিকাদের মাঝে শিক্ষা প্রসারের জন্য বিদ্যালয়ে ড্রইং শিক্ষাসহ সিলেবাস উন্নয়ন ও যুগোপযোগী করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন।

যাহোক, ১৯০৮ সালে গঠিত সাবকমিটির উদ্যোগ কতিপয় সুপারিশ উপস্থাপন করেছিলেন। সুপারিশসমূহে ছাত্রীদের বৃত্তিদান, বালিকা স্কুল স্থাপন, স্কুল-কলেজে বাংলা ও উর্দু ভাষায় শিক্ষা প্রবর্তনের বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়। নারীদের শিক্ষায় আকৃষ্ট করার জন্য ইডেন কলেজে একটি মুসলিম ছাত্রীনিবাস স্থাপনের বিষয় সুপারিশমালায় উল্লেখ করা হয়েছিল।

নেপোলিয়ন বোনাপার্ট[৩৫] বলেছিলেন– "Give me a good mother, I will give you a good nation" সলিমুল্লাহ উক্তিটির দ্বারা দারুণভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। তাঁর গভীর বিশ্বাস জন্মে ছিল যে, মায়েদের কাছেই শিশুর প্রাথমিক চরিত্র গঠিত হয়। সে কারণে জন্মদাত্রী মাকে তো শিক্ষিত হওয়া দরকার। এ লক্ষ্যে উপূর্যপোরি সভানুষ্ঠান করে নারী শিক্ষা বিস্তারের উপায় চিহ্নিত করেন। ১৯১১ সালের ১০ জুন অনুষ্ঠিত সভার প্রস্তাবনাসমূহ দৃষ্টে তা প্রতীয়মান হয়।

প্রস্তাবনাসমূহ ছিল নিম্নরূপ :

১. মুসলিম নারী শিক্ষায় চাহিদা মোতাবেক পৌর স্কুল চালু করণ;

২. মুসলিম বালিকাদের জন্য মফঃস্বল এলাকায় উন্নত ধরনের স্কুল চালুকরণ;

৩. মুসলিম বালিকাদের জন্য প্রাইমারী স্কুল ও জেনানা পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন;

৪. ধর্মানুভূতির সাথে সঙ্গতি রেখে পাঠ্য প্রণয়ন;

৫. মুসলিম বালিকাদের জন্য যুক্তিসঙ্গত বৃত্তির অংশ সংরক্ষণ;

৬. অন্তঃপুরে পাঠরত ছাত্রীদের প্রতি ছয়মাস অন্তর বৃত্তি প্রদানের ব্যবস্থাকরণ ও

৭. মুসলিম বালিকা শিক্ষার জন্য বগুড়া শহরে অন্ততঃ একটি মাধ্যমিক স্কুলকে প্রাদেশিকীকরণ করা।[৩৬] ইত্যাকার প্রস্তাবনাবলী নারী শিক্ষা বিস্তারের লক্ষ্যে গৃহীত হয় এবং নওয়াব সলিমুল্লাহ তা উত্থাপন ও বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

সভা-সম্মেলনের মাধ্যমে দেশব্যাপী নারী শিক্ষা প্রসারে তার ভূমিকা ছিল অসামান্য। দেশব্যাপী নারী শিক্ষা প্রসার ও জনপ্রিয় করার লক্ষ্যে ময়মনসিংহ (১৯০৮), রংপুর (১৯১১), ঢাকা (১৯১৪), বগুড়া (১৯১৪) প্রভৃতি স্থানে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে পরিগৃহীত সুপারিশের আলোকে ক্রমশ বাস্তবায়িত হয়। মাত্র ৪৫ বছর জীবন যুদ্ধের (১৮৭১-১৯১৫) অকুতোভয় সৈনিক নারীদের শিক্ষাবিস্তারে প্রাণপণ চেষ্টা করেছেন। তারই চেষ্টার ফলশ্রুতিতে নারী শিক্ষার দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীর অপসারিত হয়। বাংলায় নারী শিক্ষার সকল প্রতিবন্ধকতা বিদূরিত হয়ে আধুনিক যুগের সংস্পর্শ লাভ করে। ১৯৬০ সালে প্রভিন্সিয়াল মোহামেডান এডুকেশনাল কনফারেন্সে সভাপতির ভাষণে তাঁর প্রত্যাশা ব্যক্ত করেছিলেন... "should be imparted to our children to fit them to become good citizens and capable of discharging their various duties in life efficiently." তিনি নারী শিক্ষার অগ্রগতি সাধন করে অংশত হলেও তা পূরণ করতে পেরেছেন। *[সংক্ষেপিত]*

---

[৩৪] Proceedings of the Legislative Council of Eastern Bengal and Assam. April 6, 1908।

[৩৫] ফরাসি সমর নেতা, রাজনীতিবিদ ও সম্রাট (১৮৬৯-১৯২১)।

[৩৬] Proceedings of a meeting of the Mohammedan Sub-committee on Female Education. June 10, 1911. বিস্তারিত দেখুন : ড. মো. আলমগীর, মুসলমানদের শিক্ষার উন্নয়ন ও জীবন গঠনে নওয়াব স্যার সলিমুল্লাহ, ঢাকা-২০১৪, পৃ. ৬২।

রাসূল (ﷺ)-এর শাসনব্যবস্থা

মূল : ড. হাফিয আহমাদ আজাজ আল কারামি

ভাষান্তর : তানযীল আহমাদ*

[দ্বিতীয় পর্ব]

الإدارة (ইদারাহ্) বা 'পরিচালনা' পরিভাষাটির অর্থ

الإدارة (ইদারাহ্) শব্দটি আল কুরআনের কোনো আয়াতে আসেনি। তবে ক্রিয়াবাচক "تُدِيْرُوْنَهَا" শব্দটি নিম্নোক্ত আয়াতে এসেছে–

﴿إِلَّا أَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيْرُوْنَهَا﴾

"তবে যদি উপস্থিত কোনো ব্যবসা হয় যা তোমরা ধরে থাকো...।"[৩৭] তেমনি আরেকটি ক্রিয়া "تَدُوْر" এসেছে–

﴿يَنْظُرُوْنَ إِلَيْكَ تَدُوْرُ أَعْيُنُهُمْ﴾

"তারা আপনার দিকে তাকায় যে অবস্থায় তাদের চোখগুলো উলট-পালট করতে থাকে।"[৩৮]

ইদারাহ্ শব্দের মূল ধাতু دار থেকে বিভিন্ন ক্রিয়া আল কুরআনে এসেছে; যা "আল মু'জামুল মুফাহরাস লি আলফাযিল কুরআনে" বর্ণিত হয়েছে।[৩৯]

তেমনি হাদীসেও ইদারাহ্ শব্দটি সরাসরি বর্ণিত হয়নি।[৪০]

অভিধান গ্রন্থগুলোও دور শব্দ এবং এর থেকে নির্গত বিভিন্ন শব্দের অর্থ বর্ণনা করলেও إدارة শব্দের অর্থ বর্ণনা করেনি। তবে আল রাযী (মৃ. ৬৬৬ হি.) তার "আস সিহাহ"[৪১], ইবনুল মানযুর (মৃ. ৭১১ হি.) তার "আল লিসান"[৪২], ফিরোযাবাদী (মৃ. ৮১৬ হি.) তার "আল কামুসুল মুহীত"[৪৩], যাবীদি (মৃ. ১২০৫ হি.) তার "তাজুল আরুস"[৪৪] নামক বিখ্যাত অভিধান গ্রন্থাবলীতে إدارة-এর কাছাকাছি শব্দের ব্যাখ্যা করেছেন। হুবহু الإدارة-এর অর্থ বর্ণনা করেননি।

দুযী أدار শব্দ উল্লেখ করে এর ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি বলেন,

أدار السياسة : أي دبر أمورها وساس الرعية وكذلك "أدار" بمعنى جهد في العمل.

রাজনীতি পরিচালনা করা, অর্থাৎ- রাজনৈতিক বিষয়াবলীর পরিচালনা করা এবং প্রজা-সাধারণের পরিচালনার ভার গ্রহণ করা। তেমনি أدار শব্দের অর্থ কোনো কাজ পরিশ্রম করে সম্পন্ন করাও হয়।[৪৫]

উল্লিখিত আলোচনা থেকে বুঝা যায় যে, ইদারাহ্ শব্দটি একটি আধুনিক ব্যবহৃত শব্দ। এ জন্য এর সংজ্ঞাও আধুনিক গবেষকগণ দিয়েছেন এভাবে যে,

الإدارة تتكون من جميع العمليات التي تستهدف تنفيذ السياسة العامة.

প্রজা-সাধারণকে পরিচালনার সাথে সংশ্লিষ্ট সকল কার্যক্রমকে "ইদারাহ্" বলা হয়।[৪৬]

এই সংজ্ঞায় রাজনীতির সকল ক্ষেত্র যেমন নগর ব্যবস্থাপনা, অর্থনৈতিক কাঠামো, সামরিক ও বিচারিক বিষয়াদিসহ বহু বিষয় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

আরব গোত্রসমূহের শাসন ব্যবস্থা : ভৌগলিক ও প্রাকৃতিক কারণেই আরবরা দুই স্থানে তাদের জীবনধারা প্রবাহিত করেছে। শহুরে জীবন ও বেদুঈন জীবন। যারা শহরবাসী তারা তৎকালীন আরবের নগর ও গ্রামীণ অঞ্চলে বসবাস করত। তারা ব্যবসা-বাণিজ্য, কৃষি ও পশুপালন করে জীবিকা নির্বাহ করত। বেদুঈনরা মরু অঞ্চলে বসবাস

---

* *শিক্ষক : মাদ্‌রাসা দারুস সুন্নাহ-মিরপুর; যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক, জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশ।*

[৩৭] *সূরা আল বাক্বারাহ্, ২/ ২৮২।*

[৩৮] *সূরা আল আহ্যা-ব, ৩৩/ ১৯।*

[৩৯] *আল মু'জামুল মুফাহরাস লি আলফাযিল কুরআন- মুহাম্মাদ ফুয়াদ আব্দুল বাকী, পৃ. ২৬৪, ২৬৫।*

[৪০] *আল মু'জামুল মুফাহরাস লি আলফাযিল কুরআন- মুহাম্মাদ ফুয়াদ আব্দুল বাকী, পৃ. ১৫৭, ১৫৮।*

[৪১] *মুসতারুয সিহাহ- রাযী, মুহাম্মাদ বিন আবী বাকর বিন আব্দুল কাদির (মৃ. ৬৬৬ হি.), পৃ. ২১৫, ২১৬।*

[৪২] *ইবনুল মানযুর, জামালুদ্দীন মুহাম্মাদ (মৃ. ৭১১ হি.), লিসানুল আরব, ৪/২৯৫-৩০০।*

[৪৩] *ফিরোযাবাদী, মাযদুদ্দীন মুহাম্মাদ বিন ইয়াকুব (মৃ. ৮১৬ হি.), আল কামুসুল মুহীত, ২/৩১-৩২।*

[৪৪] *আয যাবীদি, মুহাম্মাদ মুরতাযা (মৃ. ১২০৫ হি.), তাজুল আরুস, ৩/২১৩-২১৮।*

[৪৫] *ডেনহার্ট দুযী, তাকমিলাতুল মাআজিম আল আরাবীয়া- মুহাম্মাদ খালীম নুআইমি অনূদিত, ৪/ ৪৩৪।*

[৪৬] *এই সংজ্ঞা মূলত পশ্চিমা গবেষকদের। তমাবী, সুলাইমান মুহাম্মাদ, মাবাদিউ ইলমিল ইদারাহ্ আল আম্মাহ- পৃ. ২১।*

করত। উটের দুধ ও গোস্ত ছিল তাদের প্রধানতম খাবার।[৪৭]

বেদুঈনদের নিকটে গোত্রীয় শাসন পদ্ধতিই ছিল সামাজিক মৌলিক কাঠামো। এটিই ছিল মূলত আরব জাতির সবচেয়ে বড় রাজনৈতিক প্লাটফরম।[৪৮]

আর এর মাধ্যমেই তারা তাদের রাজনৈতিক, পরিচালনাগত ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড চর্চা করত। আমরা গোত্রীয় জীবন ব্যবস্থায় কোনো সুনির্দিষ্ট নিয়ম-নীতি, সুষ্ঠু পরিচালনা পদ্ধতি দেখতে পাই না। যদিও সে সমাজে বেশ কিছু রেওয়াজ-রীতির প্রচলন ছিল এবং গোত্রের লোকেরা তা সামাজিক দায়বদ্ধতার কারণে এড়িয়ে যেতে পারত না।

গোত্রীয় শাসনব্যবস্থায় আমরা যে পরিভাষাটির সাথে সর্বাগ্রে পরিচিত হই তা হলো (الشيخ) শেখ। যিনি ছিলেন মূলত গোত্রপতি। তাকে رئيس (রঈস), أمير (আমীর), زعيم (যাঈম) নামেও অভিহিত করা হতো।[৪৯]

তবে শেখ উপাধীটিই ছিল সমধিক প্রসিদ্ধ। যিনি শেখ বা গোত্রপতি হতেন তাকে অনেক গুণের আধার হওয়া ছিল আবশ্যক। যেমন- বদান্যতা, উত্তম আচরণ, সাহসিকতা, নেতৃত্বের সমূহ গুণাবলী। যেগুলো দিয়ে তিনি যুদ্ধ বা সাধারণ অবস্থায় গোত্র পরিচালনা করতে সক্ষম হতেন। সাহিত্য ও কবিতার কিতাবগুলো গোত্রপতিদের গুণাবলী বর্ণনা করেছে ব্যাপকভাবে। তাদের দানশীলতা, বীরত্ব, ধৈর্য, বিচক্ষণতা, বিনয় ও বাগ্মীতার বর্ণনায় সাহিত্যের কিতাবগুলো ভরপুর। কবি লাকিত ইবনু ইয়ামুর আল ইয়াদি বলেন,

فقلدوا أمركم - لله دركم * حب الذراع بأمر الحرب مضطلعا.

لا مشرفا إن رخاء العيش ساعده * ولا إذا عض مكروه به خشعا.

ما انفك يحلب در الدهر أشطره * يكون متبعا طورا ومتبعا.

حتى استمرت على شزر مريرته * مستحكم السن لا قمحا ولا ضرعا.

তোমরা এমন নেতার আনুগত্যের জন্য প্রস্তুত হও,
যিনি যুদ্ধের সময় বিচক্ষণতার পরিচয় দেন, নিজেকে বিলিয়ে দেন।
এমন নেতার পিছনে থেকো না ; বিলাসিতা যার পৌরুষকে ধ্বংস করেছে,
আর যে সামান্য বিপদেই বিচলিত হয়ে পড়ে,
যে দুনিয়ার ভোগ-বিলাসে মত্ত, দুর্বলচিত্ত।
এমন নেতার প্রতি তোমাদের দায়িত্ব অর্পন করো যিনি সকল বিষয়ে পারদর্শী,
শক্তিশালী, দৃঢ় চিত্তের অধিকারী।[৫০]

অবশ্য এসব গুণাবলী ভৌগলিক পরিবেশের কারণে প্রাকৃতিকভাবেই আরবদের মধ্যে ছিল। তাদের জন্য এমন নেতার প্রয়োজন ছিল যিনি তাদের সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিবেন, তাদের রক্ষা করবেন এবং দয়াপরশ হবেন। আরবরা এসব ভালো করেই জানত। সালম বিন নাওফাল বলেন,

আমরা তাকেই আমাদের নেতা নির্বাচন করি যিনি তার তাবুকে আমাদের জন্য উন্মুক্ত রাখেন, তার সম্মান-মর্যাদাকে আমাদের জন্য বিছিয়ে দেন এবং সম্পদকে আমাদের জন্য বিলিয়ে দেন।[৫১]

তদুপরি, শেখ/গোত্রপতিকে উচ্চ বংশীয় হতে হতো। আরবদের প্রকৃতি হলো অন্য কারো বা নিচু বংশীয় কারো নেতৃত্ব মেনে না নেয়া। তেমনি শেখকে সঠিক সিদ্ধান্ত প্রদান ও পূর্ণ অভিজ্ঞতা সম্পন্ন হতে হতো। এ সবই ছিল গোত্রপতির অতি আবশ্যকীয় গুণাবলী।[৫২]

সাধারণ অবস্থায় একজন গোত্রপতিকে ঝগড়া-বিবাদ মিমাংসা, গোত্রীয় মেহমানদের মেহমানদারী করা, আশ্রয় প্রার্থনাকারীকে আশ্রয় প্রদান এবং তার গোত্রের সকল বিষয় দেখভালের মাধ্যমে গোত্র পরিচালনা করতে হতো।[৫৩]

যুদ্ধকালীন সময়ে যুদ্ধের সামনে থেকে নেতৃত্ব দেয়া, যুদ্ধাস্ত্রের ব্যবস্থা করা, যুদ্ধের পরিকল্পনা তৈরি করাসহ তিনি যোদ্ধাদের মনোবল চাঙ্গা রাখতে সচেষ্ট থাকতেন। যুদ্ধ শেষে গনিমত বন্টন, কেউ মারা গেলে তার রক্তপণের

---

[৪৭] *মুখতাসার তারিখ আদ দুয়াল- পৃ. ১৫৮; লিসানুল আরব- ৫/১৬৩; তাজুল আরুস, ৩/১৪৬; বুলূগুল আরব, ১/ ১২।*

[৪৮] *কালকাশানদি (মৃ. ৮২১ হি.) বলেন, (১) شعب হলো বংশের সবচেয়ে দূরবর্তী শাখা। যেমন- আদনান ও কাহতান। (২) قبيلة হলো شعب (শা'ব)-এর শাখা। যেমন- আদনানের শাখা রবীআ। (৩) عمارة হলো কবীলার শাখা। যেমন- মুযারের শাখা কুরাইশ। (৪) بطن হলো ইমারার শাখা। যেমন- কুরাইশের শাখা আবদে মানাফ। (৫) فخذ হলো বাতনের শাখা। যেমন- আবদে মানাফের শাখা বানু হাশিম। (৬) فصيلة হলো ফাখিযের শাখা। যেমন- বানু হাশিমের শাখা বানু 'আব্বাস। (৭) عشيرة হলো কোনো ব্যক্তির নিজস্ব লোকজন।* ***(দেখুন : কালকাশানদির নিহাআতুল আরব- পৃ. ১৩)***

[৪৯] *বুলূগুল আরব- আলুসী, ১/ ১৮; আন্ নুজুম আল ইসলামিয়া- ইব্‌রা-হীম আহমাদ, পৃ. ১১, ১২।*

[৫০] *নাহজুস সুলুক- সিরাযী; বুলূগুল আরব- আলুসী, ১/ ১৮।*

[৫১] *উয়ুনুল আখবার- ইবনু কুতাইবা, ১/৩২৬; আল কামিল- মুবাররাদ, পৃ. ১৬৬।*

[৫২] *উসদুল গবাহ- ইবনুল আসীর, ১/১৩৬।*

[৫৩] *আন্ নুযুম আল ইসলামিয়া- আ. আযীয দুরী, পৃ. ২৮।*

ব্যবস্থা এবং নিকটাত্মীয়ের কেউ বন্দী হলে তাকে মুক্ত করার ব্যবস্থা তাকেই করতে হতো।[৫৪]

লক্ষণীয় যে, গোত্র প্রধান গোত্র পরিচালনায় পুরোপুরি স্বাধীন থাকতেন তা নয়; বরং প্রথমে সকলের আস্থা ও সন্তুষ্টি অর্জন করতে হতো। কারণ কোনো কোনো গোত্রে বংশ পরম্পরায় নেতা হওয়ার রীতি ছিল না এবং প্রয়োজন হলে গোত্র প্রধানকে অপসারণও করা হতো।[৫৫]

অতঃপর অন্য পরিবার থেকে গোত্রপতি নির্বাচিত হতেন। অথবা গোত্রপ্রধান মারা গেলে তার ভ্রাতুষ্পুত্র বা পরিবারের অন্য শাখায় হস্তান্তর হতো। এমনকি ধারাবাহিকভাবে তিন প্রজন্মে নেতৃত্বের দৃষ্টান্ত ছিল বিরল। 'আমের ইবনু তুফাইলের (মৃ. ১০ হি.) নিম্নোক্ত কবিতাই তার শ্রেষ্ঠ প্রমাণ :

إني وإن كنت ابن سيد عامر * وفارسها المندوب في كل موكب.

فما سودتني عامر عن قرابة * أبى الله أن أسمو بأم وأب.

ولكنني أحمي حماها وأتقي * أذاها وأرمي من رماها بمنكب.

আমি যদিও আমের গোত্রপতির সন্তান,
যদিও আমের গোত্রপতির সন্তান,
যদিও আমের গোত্রের শ্রেষ্ঠ ঘোড়সওয়ার, যিনি সকল যুদ্ধে বীরত্বের পরিচয় দিয়েছেন তার সন্তান,
কিন্তু যে কারণে আমি নেতা হইনি,
আমি চাই না পিতা-মাতার নাম ভাঙ্গিয়ে আমি নেতৃত্ব দখল করব।
কিন্তু হ্যাঁ, আমের গোত্রকে রক্ষা করে, তার দায়িত্বভার বহন করে
এবং শত্রুকে প্রতিহত করেই আমি নেতা হয়েছি।[৫৬]

ইবনু খালদুন এর কারণ বর্ণনা করে বলেন, কারণ নেতৃত্ব আসে চরম মাত্রার গোত্রপ্রীতি, উচ্চ বংশীয় হওয়া এবং উন্নত গুণাবলীর কারণে। আর এসব গুণাবলী সন্তান থেকে নাতি পর্যন্ত দুর্বল হতে থাকে। এমনকি চতুর্থ স্তরে গিয়ে প্রোপুত্র তার দাদা-পরদাদার রীতি-নীতি থেকে সরে আসে। তাদের মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় যে উন্নত গুণাবলী সহায়ক ছিল সেসবকে সে নষ্ট করতে থাকে। সে মনে করে নেতৃত্বের মর্যাদা কোনো কষ্ট ছাড়া এমনিতেই প্রতিষ্ঠা হয়েছে। কাজেই এটি তাদের বংশীয় অধিকার। ফলে সে চরম মাত্রার গোত্রপ্রীতি প্রদর্শনকারীদের থেকে নিজেকে পৃথক করে তাদের উপরে নিজেকে মর্যাদাবান মনে করে।[৫৭]

[৫৪] *উয়ূনুল আখবার- ইবনু কুতাইবা, ১/২২৬।*
[৫৫] *বুলূগুল আরব- আলুখী, ১/১৮।*
[৫৬] *দিওয়ানে আমের- আমের ইবনু তুফাইল, পৃ. ১৩; উয়ূনুল আখবার- ইবনু কুতাইবা, ১/২২৭।*
[৫৭] *আল মুকাদ্দিমা- ইবনুল খালদুন, পৃ. ১৫৪।*

সফল গোত্রপ্রধান তাকেই বিবেচনা করা হতো যিনি গোত্রের গণ্য-মান্য ব্যক্তিদের সাথে পরামর্শ করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতেন। সেই ব্যক্তিদের বৈঠককে মজলিসে শূরা (مجلس الشورى), হাইয়া **উলয়া** (الهيئة العليا) (সর্বোচ্চ পর্ষদ), মাশিখাতুল **কবীলা** (مشيخة القبيلة), অথবা কবিদের ভাষায় মজলিসে সুরাত (مجلس السراة) বলা হয়।

মক্কার শাসনব্যবস্থা[৫৮] **:** এই অঞ্চলের প্রশাসনিক অবস্থা সম্পর্কে জ্ঞাতব্য খুবই নির্দিষ্ট ও নির্ধারিত। ইসলাম পূর্ব মক্কা ও মদীনায় প্রচলিত সামগ্রিক অবস্থা জানলেই উক্ত অঞ্চল সম্পর্কে মৌলিক ধারণা অর্জন হয়। মক্কার ব্যাপারে তো আমরা জানি যে, সেখানে আপতিত প্রয়োজন মেটানো, সুরক্ষা দেয়া এবং সেখানে 'ইবাদত-বন্দেগীর সুব্যবস্থার জন্য যে প্রশাসন দরকার তা বিদ্যমান ছিল। ইতিহাসের উৎসগুলো মক্কার প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনায় দুই জন ব্যক্তির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার প্রতি ইঙ্গিত করে। তারা হলেন, কুসাই বিন কিলাব এবং হাশেম বিন আবদে মানাফ। ইতোপূর্বে মক্কায় বিভিন্ন গোত্রের উপস্থিতি ও দায়িত্ব পালন অব্যাহত ছিল। যা ইসমা'ঈল আলাইহিস সালামের মাধ্যমে সূচিত ও খুযাআদের দায়িত্ব গ্রহণের মাধ্যমে সমাপ্ত হয়েছিল। সে সময় বাইতুল্লাহর গিলাফ পড়ানো, অর্থ-সম্পদের হিসাব এবং যাবতীয় দেখভালের দায়িত্ব পালন করা হতো।[৫৯]

কুসাই ইবনু কিলাবই সর্বপ্রথম নগর পরিচালকের মর্যাদা অর্জন করেন। কারণ তিনি বিভিন্ন উপত্যকা ও পাহাড়ে বসবাসরত গোত্রসমূহকে মক্কায় একত্রিত করে তার গোত্রের মাঝে চার ভাগে বিভক্ত করে দেন। অতঃপর তারা সেখানে আবাসন ব্যবস্থা গড়ে তোলে। অথচ পূর্বে কাবা শরীফের সম্মানে কেউ মক্কায় বাড়ি-ঘর নির্মাণ করত না। দিনের বেলা মক্কায় কেউ প্রবেশ করত না। রাত হলে হালাল স্থানে গমন করত। কুসাই যখন সবাইকে একত্রিত করলেন তখন সেখানে বাড়ি-ঘর নির্মাণেরও অনুমতি দিলেন।[৬০]

[৫৮] *মক্কাকে মক্কা বলার কারণ হলো– لأ نها تبك أعناق الجبابرة -তা অত্যাচারী শাসকদের ঘাড় ভেঙ্গে দিয়েছে। অথবা মক্কা অর্থ প্রচুর ভীর, যেখানে লোকজনের ভীর লেগে থাকে। কেউ কেউ বলেন, মক্কা একটি শহরের নাম। আর بكة (বাক্কা) গৃহ/বাইতুল্লাহর নাম। মক্কাকে أسر-মাথা, صلاح -সংশোধন, أم رحم -মূল, أم القرى -জনপদের মূল কেন্দ্র ইত্যাদি নামেও অভিহিত করা হয়। **(দেখুন : মুখতাসার কিতাবুল বুলদান- ইবনুল ফাকীহ হামদানী, পৃ. ১৬, ১৭ ও অন্যান্য)***
[৫৯] *আখবারে মক্কা- আযরাকী, খণ্ড : ১, পৃ. ৫৯।*
[৬০] *তবাকাত- ইবনু সা'দ, ১/৫৫; আল মুনাম্মাক- ইবনু হাবীব, পৃ. ৮৩, ৮৪; আখবারে মক্কা- আযরাকী, ১/৬০, ৬৫ ও অন্যান্য।*

ফলে বানু বাগীয বিন আমের, বানু তাইম, বানু মুহারিব বিন ফিহর মক্কার উপকণ্ঠে বসবাস শুরু করল। তাদেরকে বলা হতো উপকণ্ঠের কুরাইশ (قريش الظواهر)।[৬১]

আর অন্যান্য উপশাখাগুলোকে সমতল ভূমির কুরাইশ (قريش البطاح) বলা হতো এবং এই ঐতিহাসিক কারণেই কুসাইকে **'একত্রিতকারী'** উপাধিতে ভূষিত করা হয়।[৬২]

কবি বলেন,

أبوكم قصي كان يدعى مجمعا * به جمع الله القبائل من فهر.

وأنتم بنو زيد أبوكم * به زيدت البطحاء فخرا على فخر.

তোমাদের জনক হলেন কুসাই, যাকে একত্রিতকারী বলা হয়। তার মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা ফিহরের গোত্রগুলোকে একত্রিত করেছেন। আর তোমরা হলে বানু যাইদ (কুসাইদের আরেক নাম)। তিনি তোমাদেরও জনক। তার কারণে সমতল ভূমিসমূহ গর্বে বুক ফুলিয়েছে।[৬৩]

এর মাধ্যমে কুসাই তার গোত্রের আস্থা ও ভালোবাসা অর্জন করতে সক্ষম হন। অতঃপর তারা তাকে তাদের নেতা হিসেবে পছন্দ করে। তিনিই কা'ব ইবনু লুআইয়ের বংশধরের প্রথম ব্যক্তি যিনি তাদের নেতৃত্বের আসনে আসীন হলেন এবং তারা মেনেও নিলো।

কুসাই মক্কায় দারুন নাদওয়া (পরামর্শ সভা/তৎকালীন মক্কার পার্লামেন্ট) প্রতিষ্ঠা করলেন।[৬৪]

এটি ছিল মক্কার বিচার-ফায়সালা ও প্রশাসনিক ব্যবস্থার কেন্দ্রবিন্দু। তারা বিয়ে-শাদী, বিশেষ পরামর্শ এবং যুদ্ধের প্রস্তুতিস্বরূপ পতাকা বাঁধাসহ যাবতীয় গুরুত্বপূর্ণ কাজ এখান থেকেই সম্পন্ন করতেন। এমনকি কোনো মেয়ে প্রথম ঋতুবর্তী (বালেগা) হলে দারুন নাদওয়ায় প্রবেশ করত। সেখানের মূল পরিচালক সেই মেয়ের বক্ষবন্ধনী ছিড়ে ফেলতেন, এরপর সে বিশেষ পর্দা পালন করা শুরু করত। কুসাই ইবনু কিলাব নিজ হাতে এ কাজটি করতেন। পরবর্তীতে তার এ সকল কাজ ধর্মীয় অনুশাসনের মতো করে মেনে চলা হতো।[৬৫]

এই দারুন নাদওয়া থেকেই ব্যবসায়ী কাফিলা যাত্রা শুরু করত এবং সামানা নিয়ে ফিরে এলে তার প্রাঙ্গনে প্রথমে অবতরণ করত। কাজেই বলা যেতে পারে যে, দারুন নাদওয়া ব্যক্তি থেকে সমাজ, সকল ক্ষেত্রের জন্যই মূল কেন্দ্র হিসেবে বিবেচিত হতো।[৬৬]

সাধারণ মক্কাবাসীরা কাবা প্রাঙ্গনে একত্রিত হতো। যে স্থানকে বলা হতো নাদিল ক্বওম (نادي القوم)। আর দারুন নাদওয়ায় কেবল গোত্রের নেতৃত্বাস্থানীয় ব্যক্তিবর্গই প্রবেশ করতে পারত। তারা সেখানে বিভিন্ন গোত্র, উপ-গোত্রের নানাবিধ বিষয় নিয়ে আলোচনা করত। তবে শাখা-উপশাখা গোত্রগুলোর স্বতন্ত্র বৈঠকখানাও থাকত। যেখানে তারা তাদের আভ্যন্তরীণ ছোট-খাট সমস্যার সমাধান করত।[৬৭]

জাহেলি কবি আরব গোত্রপতিদের দায়িত্বের বর্ণনা দিয়ে বলেন,

والبيت لا يبتنى إلا له عمد * ولا عماد إذا لم ترس أوتاد.

لا يصلح الناس فوضى لا سراة لهم * ولا سراة إذا جهالهم سادوا.

إذا تولى سراة القوم أمرهم * نما على ذاك أمر القوم فازدادوا.

কোনো গৃহ খুঁটি ছাড়া নির্মাণ হয় না
আর খুঁটিও তৈরি হয় না যদি শক্ত পেরেক না থাকে
ঐ লোকেরা ঝগড়া মিটাতে পারে না যাদের কোনো নেতা নেই
আর কোনো নেতাও হতে পারে না যদি মুর্খরা নেতৃত্ব দেয়
যদি প্রকৃত নেতারা নেতৃত্বের দায়িত্ব গ্রহণ করে,
তাহলে জাতি সমৃদ্ধ হয় এবং তারা বৃদ্ধি পেতে থাকে।[৬৮]

সুরাত/গণ্য-মান্য ব্যক্তিদের একটা স্পষ্ট প্রভাব গোত্র প্রধান শেখের উপরে বর্তমান ছিল। যুদ্ধ কিংবা সাধারণ অবস্থায় পলিসি কী হবে এ ব্যাপারে তারা সিদ্ধান্ত দিত। সাধারণত শেখের তাঁবুতেই তাদের পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হতো। কোনো কোনো গোত্রে বিশেষ বৈঠকখানা ছিল যেখানে সন্ধ্যা বেলায় তারা আড্ডা দেয়ার জন্য একত্রিত হতো।[৬৯]

---

[৬১] *তবাকাতে ইবনু সা'দ- ১/৭৩; আনসাব- বালাযুরি, ১/৩৯।*

[৬২] *তবাকাত- ১/৫৫; আল মুনাম্মাক- পৃ. ৮৩, ৮৪; আখবারে মক্কা, ১/৬৩, ৬৪।*

[৬৩] *হুযাফা বিন গানেম আল কুরাশীর কবিতা; তবাকাত- ১/৭১; আল মুনাম্মাক- পৃ. ৮৪ ও অন্যান্য।*

[৬৪] *সুহাইলী বলেন, দারুন নাদওয়া অর্থ হলো– একত্রিক হওয়ার ঘর। যেখানে মক্কার বিশিষ্ট লোকেরা পরামর্শের জন্য একত্রিত হতো। পরবর্তীতে এই ঘরের মালিকানা হাকিম বিন হিযামের নিকট চলে যায়। মু'আবিয়ার আমলে তিনি তা এক লক্ষ দিরহামের বিনিময়ে বিক্রি করেন।*

[৬৫] *সিরাতে ইবনু হিশাম- খণ্ড : ১/১২৫; তবাকাত- খণ্ড : ১/৭৭; আখবারে মক্কা- ১/৬৫, ৬৬।*

[৬৬] *সিরাতে ইবনু হিশাম- ১/১২৫; তারিখে তবারি- ২/২৫৮, ২৫৯।*

[৬৭] *নুজুম যিয়াসি- পৃ. ১০।*

[৬৮] *জাহেলি কবি উফুওহ আল আওদি, প্রাচীন জাহেলি কবি। মূল নাম সলাআ বিন আমর। ঠোঁট যুগল মোটা হওয়ায় এবং দাঁতগুলো প্রকাশ থাকায় তাকে أفوه বলা হয়। আত তরায়িফ আল আদাবিয়া, পৃ. ৩।*

[৬৯] *নুযুম- আদ্ দুরী, পৃ. ৭; মক্কা ওয়া মাদীনা- শরীফ, পৃ. ২৬, ২৭।*

গোত্র পরিচালনার নীতি বা সংবিধান বলতে পূর্ব পুরুষের অনুসৃত রীতি-নীতি ও পালনীয় সংস্কৃতিকেই বুঝাত। তাদের ব্যাপারেই আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

﴿وَكَذَٰلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِم مُّقْتَدُونَ﴾

"এভাবে তোমার পূর্বে কোনো জনপদে যখনই কোনো সতর্ককারী প্রেরণ করেছি তখন ওর সমৃদ্ধশালী ব্যক্তিরা বলতঃ আমরাতো আমাদের পূর্ব-পুরুষদেরকে পেয়েছি এক মতাদর্শের অনুসারী এবং আমরা তাদেরই পদাঙ্ক অনুসরণ করছি।"[৭০]

প্রকৃতপক্ষে 'আসাবিয়্যাহ্ (عصبية) বা গোত্রপ্রীতি শব্দের মধ্যেই আরব জাহেলিয়াতের অনুসৃত রীতি নীতি প্রকাশিত হয়। কারণ 'আসাবিয়্যার আলোকেই তারা বিভিন্ন নিয়ম-কানুন তৈরি করত এবং তা মেনে চলত।[৭১]

শেখ, সুরাত ছাড়াও গোত্রীয় পরিচালনা নীতিতে আরো অনেকের ভূমিকা ছিল। যেমন- العريف ('আরিফ)।[৭২] আরিফের ভূমিকা ছিল গোত্র পরিচালনার দায়িত্ব পালন করা। বিশেষ করে ঐ সকল গোত্র যেগুলো কোনো রাজ্য বা রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার অধীনে ছিল। আরিফ রাজার পক্ষ থেকে ঐ গোত্রে প্রতিনিধি হিসেবে দায়িত্ব পালন করত।

النقيب (নাক্বীব)। তারও কাজ ছিল পরিচালনা কাজে অংশগ্রহণ। তবে তার পদমর্যাদা তত বেশি ছিল না। কিন্তু গোত্রের পরিচালনায় তাদের গুরুত্ব থাকত। অনেকেই আরিফ ও নাকিবকে একই ব্যক্তি বলে দাবী করেছেন। আরেকটি পদ ছিল الرائد (রায়েদ)। তার দায়িত্ব ছিল গোত্রের জন্য পানি ও তৃণলতা, ঘাসের অনুসন্ধান করা। নিঃসন্দেহে এটি ছিল খুব মারাত্মক দায়িত্ব। কারণ এর উপরেই বেদুঈন আরব ও তাদের পশুগুলোর জীবন নির্ভরশীল ছিল।

সামরিক ক্ষেত্রে গোত্রের বিভিন্ন দায়িত্ব বন্টিত ছিল। যেমন الربيئة (রবীআহ্)। তার পদের দায়িত্ব ছিল শত্রু সম্পর্কে সজাগ থাকা। যেন অতর্কিত আক্রমণের শিকার থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। الفارس (ফারেস) –যার উপরে যুদ্ধের ফলাফল নির্ভর করত। অর্থাৎ- যুদ্ধে চূড়ান্ত বিজয়ের জন্য তিনি দায়িত্বপ্রাপ্ত ছিলেন। حامل الراية (হামিলুর রইয়াহ্) বা পতাকা বহনকারী। তিনি যুদ্ধের পতাকা বহন করতেন, তার পতাকার অধীনেই যোদ্ধারা যুদ্ধ করত, সেখানে এসে একত্রিত হতো। এছাড়াও الشعراء, الكهنة, العرافون অর্থাৎ- জ্যোতিষ, গণক ও কবিদেরও আরব কবীলায় বেশ প্রভাব ছিল।[৭৩]

তেমনি বিভিন্ন অপরাধের শাস্তি যেমন গোত্র থেকে বহিষ্কার, নির্বাসন ইত্যাদিরও বিধান যে সমাজে বলবৎ ছিল। যারা বড় বড় অপরাধ যেমন হত্যা, চুরি ও আত্মসাৎ-এর অপরাধে জড়িয়ে পড়ত তাদেরকে বহিস্কার ও নির্বাসনের শাস্তি দেয়ার নিয়মও ছিল।

প্রাচীন উৎসগুলোর বরাতে জানা যায় যে, গোত্রপ্রধান পদাধিকার বলে বেশ কিছু মর্যাদাগত ও বস্তুগত সুবিধা ভোগ করতেন। মর্যাদাগত সুবিধা হলো– তিনি গোত্রের সর্বোচ্চ সম্মানিত ব্যক্তি, তাকে আনুগত্য করতে হতো আবশ্যকীয়ভাবে, কেউ তার সম্মানহানি করতে পারত না ইত্যাদি। বস্তুগত সুবিধা ছিল, তিনি مرباع বা গণিমতের এক চতুর্থাংশ পেতেন, صفايا বা প্রাপ্ত গনিমত থেকে তিনি চাইলে উৎকৃষ্টমানের ঘোড়া, তরবারি ও দাসী বাছাই করে নিতে পারতেন, نشيطة বা গনিমত বন্টনের পূর্বেই যদি কিছু পেয়ে যেতেন তাহলে তা নিজের জন্য রেখে দিতে পারতেন এবং فضول বা পরিমাণ/সংখ্যায় কম হওয়ায় যা বন্টন করা যেত না তাও গোত্রপ্রধান নিতে পারতেন। কবি বলেন,

لك المرباع منه والصفايا * وحكمك والنشيطة والفضول.[৭৪]

তদুপরি, শেখ চাইলে তার উট ও পালিত পশুর জন্য চারণভূমি নির্দিষ্ট করে নিতে পারতেন। যেমনটি বানু তাগলিবের সর্দার কুলাইব বিন রবীআ করেছিলেন।[৭৫]

কাজেই আমরা বলতে পারি, আরব কবিলার পরিচালনাগত দায়িত্বগুলো করিলার সেবা, আভ্যন্তরীণ প্রয়োজন পূরণ এবং নিজেদের মধ্যে ঐক্য বজায় রাখার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। এগুলো অনুসরণযোগ্য ও সুনির্দিষ্ট পদ্ধতির কোনো পরিচালন পদ্ধতি ও দায়িত্ব ছিল না। *[চলবে ইন্‌শা-আল্লাহ]*

---

[৭০] *সূরা আয্ যুখরুফ : ২৩।*
[৭১] *মাজমাউল আমসাল- আল মায়দানী, খণ্ড : ১, পৃ. ১৭।*
[৭২] *আল লিসান- ইবনুল মানযুর, ৯/২৩৮।*
[৭৩] *বুলূগুল আরব- আলুসী, ২/৮৪, ৮৫, ২৩৯।*
[৭৪] *কবি আব্দুল্লাহ বিন আনামার কবিতাংশ, আসমাঈ, আসমাঈয়াত, পৃ. ৩৭।*
[৭৫] *আল হাইওয়ান- আল জাহেয, ১/৩২০।*

নিভৃত ভাবনা

হক্বের পথে টিকে থাকা কতই না কঠিন!

মূল : মানসুর আহমাদ মল্লীক*

গ্রন্থনায় : জহির বিন জাহাঙ্গির*

১৯৫৩ সনে আহলে হাদীস মতামত গ্রহণ করার পর হতে অদ্য পর্যন্ত ঘটনাবলীর সংক্ষিপ্ত বিবরণী।

আমার নাম মানসুর আহমাদ মল্লিক, পিতা- মরহুম মুহাম্মদ মনু মল্লিক। গ্রাম : মাদারসী, ডাকঘর : ধামসর, থানা : উজিরপুর, জেলা : বরিশাল, ম্যাট্রিক সার্টিফিকেটে জন্ম : ০১.১০.১৯২৪। সঠিক বয়স জানা নেই।

ঈসায়ী ১৯-০২-১৯৪৫ তারিখে ক্যাসকাটা পুলিশে ভর্তি হয়ে ট্রেনিং, এরপর খিদির পুরে পোস্টিং হয়ে ১ বছর কর্মরত থেকে ধর্ম-কর্ম পালনে ব্যাঘাত ঘটায় এবং রোজগার অবৈধ হওয়ার সম্ভাবনা থাকায় রামাযান মাসের একদিন ইফতারির সময় এ চাকরি হতে অব্যহতি পাওয়ার জন্য মুনাজাত করায় আল্লাহ তা'আলা মঞ্জুর করেন। ১৯৪৬ সালে অক্টোবর মাসে ছুটি নিয়ে বাড়ি আসি। বৃহত্তর ফরিদপুরের কোটালীপাড়া থানাধীন বহুলতরলী গ্রামে মাওলানা আব্দুর রাজ্জাক শিকদারের জ্যৈষ্ঠ কন্যার সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হই। তিনি পুলিশের চাকরি ছেড়ে দিয়ে পড়াশুনা করার জন্য উপদেশ দান করায় আমি উক্ত চাকরি ছেড়ে দিয়ে পড়াশুনা করে ১৯৪৮ সালে (S.S.C.) ম্যাট্রিক পাস করি। পরে (H.S.C.) পাশ করে শিকারপুর গঙ্গা গোবিন্দ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে চাকুরি গ্রহণ করি। কিছু কাল চাকরি করার পর পার্শবর্তী পূর্ব ধামসর গ্রামে একটি জুনিয়র মাদ্‌রাসায় চাকরি গ্রহণ করি। মাদ্‌রাসাটি বন্ধ হয়ে যাওয়ায় আমি পুনরায় ১৯৮৩ সালে শিকারপুর গঙ্গা গোবিন্দ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে চাকরি করি। ১৯৮৩ সালে হজ্জব্রত পালন করি।

আমার শ্রদ্ধেয় শ্বশুর ছিলেন একজন দ্বীনদার, পরহেজগার ও মুত্তাকী লোক। তিনি ছিলেন আহলে হাদীস মতাবলম্বী ও জমঈয়তের একনিষ্ঠ খাদেম। তাঁর সালাত আদায় করার পদ্ধতি দেখে প্রথম জানতে পেরেছি যে, সালাত আদায় করার পদ্ধতির ভিন্নতর পার্থক্য আছে। আমি আমার শ্রদ্ধেয় শ্বশুরকে জিজ্ঞাসা করলাম, অপনি চার মাযহাব ফর্‌য মানছেন না কেন? তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, চার মাযহাব ফর্‌য তা কোথায় পেলাম। আমি বললাম, মোকসুদুল মু'মিনীনে আছে। তিনি বলেন, উক্ত পুস্তকের টিকায় লেখা আছে যে উক্ত ফর্‌যের কোনো দলিল নেই, শুধু আম লোকের আকাংখ্যা পূরণের জন্য এইরূপ ১৩০ ফর্‌য সুমার করা গেল। সেটা দেখে আশ্চর্যবোধ করলাম। যা ফর্‌য নয় তা ফর্‌য লিখলেন তা আবার শুধু আমলোক নয়, আলেম উলামারাও মেনে নিলেন। আমার শ্রদ্ধেয় শ্বশুর আমাকে জানালেন যে, আহলে হাদীসগণ যে পদ্ধতিতে সালাত আদায় করে তা সব সহীহ হাদীসে আছে, কিন্তু হানাফীদের সালাত সহীহ হাদীসের সাথে মিল নেই। তিনি সিহাহ সিত্তাহ হাদীস থেকে সালাত আদায়ের পদ্ধতি দেখালেন। আমি মনে মনে ভাবলাম, যে সালাত সহীহ হাদীসের সাথে মিল নেই তা আদায় করে কি লাভ হবে। তাই ১৯৫৩ সালে আহলে হাদীস মতবাদ গ্রহণ করে সালাত আদায় করতে শুরু করলাম। আমার সাথে আমার জ্যৈষ্ঠ ভ্রাতা ৪ জন চাচাত ভাইও এরূপ সালাত আদায় করতে শুরু করে। আমাদের গ্রামে আমাদের বাড়ির মসজিদ ব্যতিত অন্য কোনো মসজিদ ছিলনা। সুতরাং গ্রামে মুসল্লিগণ এই মসজিদেই সালাত আদায় করতেন। আমাদেরকে এরূপ সালাত আদায় করতে দেখে, সারসীনা পীর সাহেবের বাড়ি গেলেন, তারা এ সব শুনে ফাতাওয়া দিলেন যে এদের সাথে সমাজ, নামায, বিবাহ-সাদি কিছুই করা যাবে না, যদি মেয়ে বিবাহ দিতে না পারে, যদি বেশ্যাও হয়ে যায় তাও ভালো। এ ফাতাওয়া শুনে বাড়ি এসে আমাকে বললেন যে, এরূপভাবে সালাত আদায় করতে দেওয়া যাবে না। এজন্য তাদের কাছে আমি এক ভয়ানক অন্যায়কারী জঘন্যতম ব্যক্তি। আমাদের গ্রামের পূর্ব দিকে চরমোনাই পীর সাহেবের বাড়ি, দক্ষিণে সারসিনা, উত্তরে আট-রশি, পশ্চিমে জৈনপুরী সাহেবের আস্থানা। অত্র এলাকায় অধিক সংখ্যক লোকই হচ্ছে পীরের মুরিদ ও মাযার পূজারী। পীরের মুরিদগণ সকলেই আমাদের উপর ক্ষিপ্ত। সমাজ থেকে আমাদেরকে বাদ দেয়া হলো। উপায়ান্ত না দেখে মনে মনে ভাবলাম যে, আমরা যা করি তা হাদীসে আছে। সুতরাং যদি বাহাস করি তাহলে প্রকাশ্যে জনসাধারণকে দেখাতে সক্ষম হব। তাই বাহাস করার প্রস্তাব দিলে আমাকে জৈনপুরী পীর সাহেবের নিকট নিয়ে যাওয়া হলো। জৈনপুরী পীর সাহেবের নিকট আমি আহলে হাদীস বলে পরিচয় দিয়ে বাহাসের প্রস্তাব দিলে তিনি তা প্রত্যাখ্যান করে বললেন যে, মাযহাব চারটা হলে মাযহাব পাঁচটা ও হতে পারে। কিন্তু হানাফীদের অনুরোধে বাহাস করতে রাজী হলেন। দিন-তারিখ ও স্থান নির্ধারণ করা হলো। নির্ধারিত তারিখে পীর সাহেবকে পালকীতে করে নিয়ে আসা হলো। দু'জন লোক আমাদের বাসায় এসে হাদীস

* *সাবেক সভাপতি, বরিশাল বিভাগ জমঈয়তে আহলে হাদীস।*

* ***মাস্টার্স,*** *আল হাদীস এন্ড ইসলামিক স্ট্যাডিজ, ইসলামী আরবী বিশ্ববিদ্যালয়, বছিলা, মোহাম্মদপুর, ঢাকা।*

এনেছি কিনা এবং এসব হাদীসে আছে কিনা জানতে চাইলে আমার শ্বশুর হাদীস থেকে তা দেখালেন।

বাহাসের স্থান আমাদের বাড়ি হতে কিছু দূরে ছিল। আমরা সেখানে যেয়ে দেখলাম পীর সাহেবের জন্য মঞ্চ তৈরি করে তার উপর চেয়ার টেবিল রাখা হয়েছে এবং তার উপর তিনি বসা আছেন। কিন্তু আমার শ্বশুরের বসার জন্য চেয়ার-টেবিল হয়নি। আমার এক ছাত্র একটা টেবিল ও একটা চেয়ার এনে বসার ব্যবস্থা করে দিলো। সেখানে তিনি বসলেন। পীর সাহেব বাহাস না করে তার এক সঙ্গীকে "জখীরা" নামক একটি পুস্তিকা পড়তে বলায় তা তিনি পড়ে শুনালেন, যাতে লেখা ছিল পীর কেরামত আলী সাহেবের বহু কেরামত। এ পুস্তিকাটি পড়া শেষ করে তিনি বললেন যে, এর পরে কি বাহাসের দরকার আছে? এখন এই দলে থাকবেন না নতুন দলে যাবেন? বলুন, "আল্লাহু আকবার"। প্রায় দশ হাজার লোকের উচ্চৈঃস্বরে আল্লাহু আকবর ধ্বনিতে চতুর্দিক মুখরিত হলো। একজন হানাফী কুরআন ও হাদীসের বাহাস শুনার দাবি করলে উক্ত ক্বারী সাহেব আমার শ্বশুরের মাথার উপর ১টা চেয়ার ছুড়ে মারলো এবং পূর্ব পরিকল্পিতভাবে মারার জন্য ছিল কিছু লোকজন। আমার শ্বশুরকে আঘাত করতে থাকায় তাঁর মাথার তিন জায়গায় জখম হলো, অনেক কষ্ট করে তাঁকে আমাদের বাড়িতে আনা হলো। এক গ্রাম্য ডাক্তার তাঁর মাথায় ব্যান্ডেজ করে দিয়ে ঔষধ সেবন করালো। তিনি একটু সুস্থ হয়ে আমাকে বললেন, মু'মিনের রক্ত যে মাটিতে পড়েছে সেখানে মহান আল্লাহর দিন কিয়ামত পর্যন্ত জারি থাকবে। তার সাথে এসেছে মাষ্টার আলহাজ্জ লুৎফুর রহমান শিকদার এবং একজন হানাফী। পীরের এহেন দুষ্টমি দেখে তিনি আহলে হাদীস মতবাদ গ্রহণ করেন।

পীর সাহেবের সাথে বাহাস করাটা আমার নাকি ভীষন অন্যায় হয়েছে। বিধায় আমাকে সমাজ হতে বাদ দিয়ে শারীরিক ও মানসিকভাবে নিপীড়ন করার সিদ্ধান্ত নেয়। বাহাসের ২/৩ দিন পর বিশেষ কারণবশত আমি খুব অসুস্থ হয়ে পড়ি। প্রায় দু'মাস পরে সুস্থ হই। আমার শ্বশুরের মাথার পাগড়ী নিয়ে এক ব্যক্তি তার নাতীদেরকে লুঙ্গী তৈরি করে পরতে দেয় এবং লাঠি দ্বারা আমার শ্বশুরের মাথায় আঘাত করেছিল তার বাসগৃহের উপর বজ্রপাত হওয়ায় একটি নাতি মারা যায় এবং ২টি নাতির শরীর পুড়ে যায়। সে সময় আমার শ্বশুর আমাদের বাড়িতে আসছিলেন। তিনি আমাকে নিয়ে তা দেখে আসেন। হানাফীগণ সিদ্ধান্ত নিলেন যে, আমাদেরকে এভাবে সালাত আদায় করতে দেয়া যাবে না। আমার এক জ্ঞাতি চাচা রাগান্বিত স্বরে বললেন যে, তুমি এভাবে সালাত আদায় করতে পরবে না। আমি দৃঢ়কণ্ঠে উত্তর দিলাম যে, আপনারাও আমাকে এ থেকে বিরত রাখতে পারবেন না। মসজিদে এভাবে সালাত আদায় করতে নিষেধ করা হলো। কিন্তু আমাদের বাড়িতে মসজিদ থাকায়, মসজিদ হতে বাহির করে দেয়া সম্ভব না হওয়ায় তারা নতুন মসজিদ নির্মাণ করার সিদ্ধান্ত নিলেন। আমাদের বাড়ির দক্ষিণ পার্শের বাড়ির পশ্চিম পার্শে ছিল ঈদগার মাঠ। আমার সেই বৃদ্ধ চাচার সালাত আদায় সুবিধার্থে সেখানে মসজিদ নির্মাণ করা হলো। আমাদের সমাজ থেকে বাদ দেয়া হলো। তারা ঐক্যমতে পৌঁছাতে না পারায় পূর্ব দিকে আর একটি মসজিদ নির্মাণ করা হলো। আমাদের বাড়ির পার্শে যারা মসজিদ নির্মাণ করলেন তারা প্রতিজ্ঞা করলেন যে, এই মসজিদেই সালাত আদায় করবে। যদি কেউ এই মসজিদ ত্যাগ করে তবে তাকে নবী (ﷺ) শাফা'আত করবেন না। কিছু কাল অতিবাহিত হওয়ার পর তাদের নিজেদের মধ্যে লেনদেন নিয়ে ঝগড়া হওয়ায় সে মসজিদ ছেড়ে অনেকে আমাদের মসজিদে চলে আসে। আর আমার পিছনেই সালাত আদায় করে কয়েক মাস পর পুনরায় তাদের পাড়ায় মসজিদ নির্মাণ করে সালাত আদায় করছে। পূর্বদিকে যে মসজিদটি নির্মাণ করা হয়েছে সেখানেও মুসল্লিদের মধ্যে মনোমালিন্য হওয়ায় আনুমানিক দু'শগজ উত্তরে আরেকটি মসজিদ নির্মাণ করে সালাত আদায় করেছে। এতে একতাবদ্ধভাবে যে দুশমনি আমাদের উপর চলছিল তা কিছুটা শিথিল হয়ে আসলেও আজ পর্যন্ত সে দুশমনির অবসান হয়নি। আমার পুরাতন আত্নীয়-স্বজন যারা আমার আশে পাশে বসবাস করছেন যেমন- মামা, ফুফা, খালু তাদের বংশধরগণ বিভিন্ন পীরের মুরিদ হওয়ায় এবং বিদআতী মুশরেকী কাজে লিপ্ত থাকায় আমাদের মাসাআলাগুলো মেনে নিতে পারছে না। তাই তারা এর বিরোধিতা করেই চলছে।

প্রথম দিকে যে নির্যাতন চালিয়ে ছিল, যার কারণে এ দেশ থেকে চলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে ছিলাম। বড় ভাইয়ের উপদেশে সে সিদ্ধান্ত ত্যাগ করি। বাহাসের পর হতে সমাজ হতে বয়কট করে সম্মানহানি জনক আচরণ করে যেভাবে আমাকে কষ্ট দিয়েছে তা বর্ণনা করতে গেলে এক পুস্তক হয়ে যাবে। কারণ নির্যাতনের ইতিহাস কয়েক যুগের ইতিহাস।

বাহাছের কয়েক মাস পর আমার শ্রদ্ধেয় শ্বশুর আমাকে নিয়ে মরহুম মাওলানা আব্দুল্লাহিল কাফী আল কোরায়শী (রাহিমাহুল্লাহ)'র সাক্ষাৎ লাভের জন্য পাবনা জমঈয়ত অফিসে গেলেন। সেখানে গিয়ে জানতে পারলাম যে, তিনি ঢাকায় গিয়েছেন। সেখানে গিয়ে তাঁর নিকট এ সমস্ত ঘটনাবলী বিবৃত করায় তিনি অত্যন্ত মর্মাহত হলেন এবং আমাদেরকে ধৈর্য ধারণ করার বহু উপদেশ দিলেন। তাঁর সুমধুর কণ্ঠের উপদেশবলী আমাদেরকে বিমোহিত করেছিল। এর পর হতে ঢাকা অফিসে যেতাম ও সাপ্তাহিক আরাফাত, মাসিক তর্জুমানুল হাদীস, আহলে হাদীস দর্পন এবং মাসিক আত্ তাহরিকের

নিয়মিত পাঠক ও গ্রাহক ছিলাম। আমাদের মাদ্‌রাসায় আহলে হাদীস গ্রন্থাগারে সিহাহসিত্তা হাদীস, মিশকা-তুল মাসা-বীহ, বুলুগুল মারাম ও তাফসীরে ইবনু কাসীরসহ এক হাজারের অধিক কিতাব মজুত করেছি। বাংলাদেশ জমঈয়তের জেনারেল কমিটির সদস্য প্রথম থেকে এ পর্যন্ত আছি। বরিশাল ও পিরোজপুরের সভাপতির দায়িত্ব আমার উপরে অর্পিত রয়েছে। বার্ধক্য জনিত দুর্বলতার কারণে এখন আর সে দায়িত্ব পালন করতে পারছি না। তবে মাদ্‌রাসা মসজিদের সেবায় এখন নিয়োজিত আছি।

(সাফল্য অর্জন)

আল্লাহ যাকে রক্ষা করেন তাকে সমস্ত মানুষ একত্রিত হয়ে ক্ষতি করতে চেষ্টা করলেও তারা ক্ষতি করতে পারে না। ওরা আমাকে সমাজ হতে বাদ দিলে আমাদের জনসংখ্যা বৃদ্ধি হলে আমরাও পৃথক সমাজ গঠন করলাম।

আমার ৪টি কন্যা। জ্যৈষ্ঠ কন্যাকে বিবাহ দেয়ার পর জামাতা মাস্টার আবুল হাসেম আহলে হাদীস মতবাদ গ্রহণ করায় তার আপন চাচা তাকে বাড়ি হতে বিতাড়িত করার হুমকি দেন, কিন্তু রহমতে ইলাহী তার জ্যৈষ্ঠ পুত্র মাস্টার আইন আলী (হাই স্কুল শিক্ষক) অত্যন্ত পরহেযগার, মুত্তাকী ও জ্ঞানী। তিনি আহলে হাদীস মতবাদ গ্রহণ করায় তার ভ্রাতৃবৃন্দসহ বহু লোক আহলে হাদীস মতবাদ গ্রহণ করেছেন। মাস্টার আইন আলী'র ২টি পুত্র। জ্যেষ্ঠ পুত্র মাওলানা ইব্‌রাহীম কাওসার সালাফী নারায়ণগঞ্জের পাঁচরুখী সালাফিয়া কাওমী মাদ্‌রাসা হতে ২০০৪ সালে ফারেগ হয়। তিনি ওখানেই মাদ্‌রাসার শিক্ষকরূপে নিয়োজিত থেকে প্রচুর অর্থ উপার্জন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। কিন্তু অর্থ লালসা পরিত্যাগ করে নিজস্ব এলাকায় খালেস দ্বীন প্রচারের উদ্দেশ্যে চাকুরি ছেড়ে দিয়ে বাড়ি আসেন। আমার বিশেষ অনুরোধে মরহুম ড. আব্দুল বারী আমাদের বাড়িতে আল মাহাদ আদ্বীন নামকরণ করে ১৯৮৫ সালে একটি মাদ্‌রাসা স্থাপনের সুব্যবস্থা করেন। উক্ত মাদ্‌রাসাটিকে মাওলানা ইব্‌রাহীম কাওসার আল মাহাদ আদ্বীনি সালাফী ক্বওমী মাদ্‌রাসা নামকরণ করেন। উক্ত মাদ্‌রাসায় তিনিই মুহতামীম এবং আমাদের বাড়ির আহলে হাদীস জামে মসজিদের খতীব। অত্যন্ত স্বল্প বেতন গ্রহণে পরিতৃপ্ত হয়ে আহলে হাদীস মতবাদ প্রচার করে যাচ্ছেন এবং মসজিদ-সহ মাদ্‌রাসার দায়িত্ব যথারীতি পালন করে যাচ্ছেন। তাঁর আব্বা মাস্টার আইন আলী আহলে হাদীস মতবাদ গ্রহণ করার পরই প্রায় ৩০ বছর পূর্বে বাড়ির সম্মুখে মসজিদ নির্মাণ করে। মসজিদের ইমাম ও খত্বিবের দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন। ইব্‌রাহীম কাওসার সালাফীর কনিষ্ঠ ভ্রাতা মাওলানা কায়েদ মাহামুদ ইমরান পাঁচরুখী মাদ্‌রাসার সানবিয়া ক্লাসের ছাত্র। মাওলানা ইব্‌রাহীম কাওসার সালাফী অত্র অঞ্চলের শ্রেষ্ঠ আলেম ও বক্তা বললে তা অতিরিক্ত হবে না। আমাদের শিকারপুর ও উজিরপুর ইউনিয়ানের উত্তরে শোলক ইউনিয়ানের মুগীহাটী গ্রামের কিছু সংখ্যক লোক আহলে হাদীস মতবাদ গ্রহণ করে। তাদের দেওয়া জমির উপর প্রতিষ্ঠিত সরকারি ফ্রি প্রাইমারি বিদ্যালয়ের মসজিদে সালাত আদায় করতে শুরু করলে ভীষণ তোলপাড় সৃষ্টি হয়। উক্ত সমস্যার সমাধানের জন্য মাওলানা ইব্‌রাহীম কাওসার সালাফীকে নেওয়া হয়। তিনি কুরআন ও সহীহ হাদীসের আলোকে দীর্ঘ সময় বক্তব্য রাখায় এবং বহু প্রশ্নের সঠিক উত্তর দানে সক্ষম হওয়ায় সেখানকার তোলপাড় স্তিমিত হয়ে যায়। তাৎক্ষণিক আরও অনেক লোক আহলে হাদীস মতবাদ গ্রহণ করে নির্বিঘ্নে সালাত আদায় করছে।

মেঝ জামাতা মাওলানা আনোয়ার হোসেন সারসিনা মাদ্‌রাসা হতে টাইটেল পাস করেছে। আমার সাহচর্যে এসে বিবাহের ৭ বছর পর আহলে হাদীস মতবাদ গ্রহণ করায় সেখানেও প্রতিবাদী ঝড় বয়ে গিয়েছিল। তাদের সমাজ এরূপ সালাত আদায় করতে বাধা দিলে ঝগড়া বিবাদ পরিহার করে সে তার নিজ বাড়িতে মসজিদ নির্মাণ করে সালাত আদায় করছে। অত্র অঞ্চলের এক নামিদামি অন্ধ পীর সাহেবে এবং অন্য একজন জাঁদরেল হাফেয ও সুবক্তাকে তাদের বাড়ির নিকট তাদের প্রতিষ্ঠিত দাখিল মাদ্‌রাসায় ওয়াজ করার জন্য এবং আহলে হাদীসদের বিরুদ্ধে বক্তব্য রাখার জন্য আমন্ত্রণ জানায়। তারা এসে আমার জামাতাকে এরং তার পিতাকে এ পথ থেকে বিচ্যুতি করার জন্য অপচেষ্টা চালায়। কিন্তু আমার প্রশ্নের সদুত্তর দিতে না পারায় অপচেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যায়। আমার মেয়ের একমাত্র পুত্র মেজবাহ উদ্দিন, যাত্রাবাড়ি মুহাম্মদিয়া আরাবিয়া মাদরারাসায় ৫/৬ বছর অধ্যয়ন করার পর তার জন্মভূমি খোদাবখসা গ্রামের সন্নিকটে বানরিপাড়া দাখিল মাদ্‌রাসা হতে পরিক্ষা দিয়ে গোল্ডেন A^+ পেয়ে, তার সাতজন চাচার পরামর্শে বাংলাদেশ সামরিক বাহিনীর লেফটেনেন্ট পদে নিয়োজিত আছে। সে ঘরে আমার তিনটি নাতনী। জ্যৈষ্ঠটিকে এক বি.এস.সি ইঞ্জিনিয়ারের সাথে বিবাহ দিয়েছে। মেজোটি কলেজে এবং ছোট্টটি স্কুলে অধ্যয়ন করছে।

আমার ৩য় কন্যাটিকে উজিরপুর থানাধীন মশাং গ্রামের নামজাদা খাঁন বাড়ির সন্তান মুহাম্মদ নূরুল ইসলাম খানের সাথে বিবাহ দেয়া হয়েছে। সে সরকারী ফায়ার সার্ভিসের অফিসার পদে নিয়োজিত আছে। তার মাত্র ২টি কন্যা। জ্যেষ্ঠ কন্যাকে এক ইঞ্জিনিয়ারের সাথে বিবাহ দেয়া হয়েছে। সে এখনও বরিশালে বি.এম কলেজের ছাত্রী। কনিষ্ঠা কন্যাটিকে বি.এ. পাস, সিঙ্গাপুরে চাকরিরত এক ছেলের সাথে বিবাহ দিয়েছে।

কনিষ্ঠা কন্যাকে চরমোনাই মাদ্‌রাসা হতে টাইটেল পাশ করা এক ছেলের সাথে বিবাহ দেয়া হয়েছে। তার মাত্র ১টি ছেলে ও ১টি মেয়ে। ছেলেটি নরসিংদী জামিয়া কাসেমিয়া কামিল মাদ্‌রাসার আলিম শ্রেণীর ছাত্র। মেয়েটি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রী।

প্রতিবেশী হানাফীদের অপপ্রচারে কোনো কোনো মেয়েকে বিবাহ দিতে গিয়ে অনেক অর্থের অপচয় ও কালক্ষেপণ করতে হয়েছে। তাতেও অনেক কষ্ট ভোগ করেছি। আমার জ্যেষ্ঠ কন্যার ৫টি মেয়ে ও ১টি পুত্র। পুত্রটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়েছে। মেয়ে ১টি বি.এ.বি.এড ২য়টি বি.এ, ৩য়টি এম.এ, ৪র্থটি আলিম কৃতিত্বের সাথে পাস করেছে। ৫মটি দাখিল, আলিম ও ফাজিল A^+ পেয়ে কামিল পড়ছে। এরা সকলেই বিবাহিতা।

আমার জ্যৈষ্ঠ পুত্র আব্দুস সবুর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হতে ১৯৮১ সালে এম.কম. ২য় বিভাগে পাস করে সৌদি সরকারি হাসপাতালে প্রায় বছর চাকরি রিজেন দিয়ে বাড়ি এসে বরিশালে একটি লোকাল বাস কিনে গাড়ির ব্যবসায় নিয়োজিত রয়েছে। বিবাহের প্রায় ১৬ বছর পর আল্লাহ তা'আলা ১টি পুত্র ও ২টি কন্যা দান করেছেন। তাদেরকে উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত করার জন্য তিনি প্রচুর অর্থ ব্যয় করেছেন। আমার পুত্র-কন্যা, নাতি-নাতনিগণ আহলে হাদীস মতবাদের উপর দৃঢ় থেকে যথারীতি ধর্ম-কর্ম প্রতিপালন ও প্রচার করে যাচ্ছে। পাড়া প্রতিবেশীর মধ্যে হতেও অনেকে আহলে হাদীস মতবাদ গ্রহণ করছে। এভাবে আহলে হাদীসের সংখ্যা বেড়েই চলেছে। আমাদের মাদ্‌রাসার সম্মুখে ৪৭ বছর পূর্বেই ঈদের মাঠ তৈরি করে আমাদের স্থানীয় মুসল্লীবৃন্দ এবং দক্ষিণ মাদ্‌রাসার মাওলানা ইব্‌রাহীম কাওসারদের বাড়ির মসজিদের মুসল্লীবৃন্দ একযোগে ১২ তাকবীরে ঈদের সালাত আদায় করে যাচ্ছি। সাহরীর আজান চালু করা হয়েছে। বিরোধপূর্ণ মাসাআলাগুলো সহীহ হাদীসের হাওয়ালা উল্লেখ পূর্বক তা ছাপিয়ে মাওলানা ইব্‌রাহীম কাউসার বিলি করে যাচ্ছেন। পুরাতন মাদ্‌রাসার সাথে ৩০ মিটার দৈর্ঘ্য একটি টিনশেড বিল্ডিং নির্মাণ করা হচ্ছে। আহলে হাদীস মতবাদ প্রচার ও প্রসারের উদ্দেশ্যে প্রতিবছর মাদ্‌রাসার প্রাঙ্গণে দুই দিন ব্যাপী ওয়াজ মাহফিলের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। এ মাহফিলে আহলে হাদীসের প্রখ্যাত আলেম, উলামা, শায়েখ, মাশায়েখ, মাদানী, সালাফীবৃন্দের আগমনে এবং সাক্ষাৎ লাভে আমরা আনন্দিত হচ্ছি ও নিজদেরকে ধন্য মনে করছি। আমাদের মাদ্‌রাসার মসজিদের সদস্যবৃন্দ মাসিক চাঁদা, এককালীন দান ও যাকাত ফিতরা, ওশর ইত্যাদি সংগৃহীত অর্থ দিয়েই মাদ্‌রাসা মসজিদের যাবতীয় খরচ চালিয়ে যাচ্ছেন।

বাহাছ-মুনাজেরা

১. আমাদের বাড়ি হতে ৪/৫ কিলোমিটার উত্তরে আটীপাড়া গ্রামে এক মসজিদে আহলে হাদীস মতালম্বী ও হাফেয ক্বারী সৈয়দ খলীলুর রহমান তিন রাকআত বেতেরসহ ১১ রাকআত তারাবির সালাত আদায় শুরু করলে তাতে বাঁধার সৃষ্টি করে। এ নিয়ে বাহাস করার আহ্বান জানায়, এ আহ্বানে সাড়া দিয়ে আমি মাওলানা ইব্‌রাহীম কাওসারকে নিয়ে মসজিদে যথাসময় উপস্থিত হই। উক্ত এলাকার এক কওমী মাদ্‌রাসা হতে সহীহুল বুখারী নিয়ে যাওয়া হয়। উক্ত গ্রামের মাদ্‌রাসার মোদার্‌রেসগণ উপস্থিত হলেন ছোট বাহাস করার আহ্বান জানিয়ে ছিলেন। তাকেই সহীহুল বুখারীর 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা)'র বর্ণিত ১১৪৭ নং হাদীসাটি (আট রাকআত তারবীর সালাত আদায় করার দলিল) পাঠ করতে বলায় তিনি তা পাঠ করেন। উক্ত মসজিদের সভাপতির ভাতিজা মাওলানা সাবকে জিজ্ঞাসা করেন যে, আট রাকআত তারাবি পড়ার দলিল পাঠ করলেন, তাহলে আট রাকআত তারাবী পড়া কি জায়িয? উত্তরে তিনি বললেন হ্যাঁ জায়িয। আমি সভাপতি সাহেবের অনুমতি নিয়ে কিছু বলার জন্য দণ্ডায়মান হলে মাওলানা সাহেব আমাকে বললেন, লা মাযহাবীর সাথে আমার কোনো কথা নেই। আমি বললাম, মাযহাব মানে যদি 'দল' হয় তাহলে আমিও এক মাযহাবের অনুসারী আর সে দলের নাম মাযহাবে মোহাম্মদী। আর আপনি চার মাযহাবে ফর্‌য মানছেন তাহলে পবিত্র কুরআনে বর্ণিত সূরা আ-লি 'ইমরান-এর ১০৩ নং আয়াত, সূরা আল আন'আম-এর ১৫৯ নং আয়াত, সূরা আর্ রূম-এর ৩২ ও ৩৩ নং আয়াত (উক্ত আয়াতগুলো দলে দলে বিভক্ত হওয়া নাজায়িয) পাঠ করে জিজ্ঞাসা করলাম যে, এ আয়াতগুলো কুরআনে আছে? না-কি এ আয়াতগুলো মানসুখ হয়ে গেছে? এর উত্তর না দিয়েই মাথা নিচু করে তারা দলবল নিয়ে চলে গেলেন। সে মজলিসের সভাপতি এখনও বলে বেড়াচ্ছেন যে, মল্লিক সাহেব কি যেন বললেন তা শুনে মাওলানারা মাথা নিচু করে চলে গেলেন।

২. খোদাবখসা দাখিল মাদ্‌রাসার শিক্ষকবৃন্দ আমন্ত্রিত হয়ে আমার মেজ জামাতার বাড়ি এসে তাদের বাড়ির আহলে হাদীস জামে মসজিদে যোহরের সালাত আদায় করে তার মাদ্‌রাসার একজন মোদার্‌রেসকে মিলাদ পড়তে আদেশ দেয়ায় তিনি পরতে আরম্ভ করলে, আমি দাঁড়িয়ে সেটা পড়তে নিষেধ করে আমার পরিচয় দিয়ে আমি বললাম, ওগুলো তো সব মিথ্যা কাহিনি আর মিলাদ পড়াতো বিদআত ক্বিয়াম করাতো শির্ক। আর আপনি ফর্‌য সালাত আদায় করেই হাত তুলে মুনাজাত করলেন তাতো আমি মক্কা ও মাদীনার ইমামদের করতে দেখলাম না। তিনি

বললেন, আপনার সাথে বাহাস আছে। আমি বললাম, আপনি বাহাস করবেন কি দিয়ে। আপনি যে পদ্ধতিতে সালাত আদায় করলেন তা কোন কিতাবে আছে? তিনি নিরুত্তর থাকায় আমি বললাম আপনার সেই কিতাবের নাম কুদুরী। সেই কদুরীর সালাত আদায় করছেন। আর আমি সহীহুল বুখারী, সহীহ মুসলিম ও অনন্য সহীহ হাদীস গ্রন্থের সহীহ হাদীস অনুযায়ী সালাত আদায় করছি। তিনি আমার সাথে আর তর্ক-বিতর্ক করলেন না।

৩. একদিন এক মসজিদে মাগরিবের সালাত এক হানাফী ইমামের সাথে সালাত শেষ করে ইমাম সাবকে বললাম, আজ শয়তান নিয়ে সালাত আদায় করলাম, ইমাম সাহেব শুনে রেগে গেলেন এবং বললেন আপনি কি বললেন, আমি বললাম আপনি কি জানেন, মুসল্লিগণ কাতারে ফাঁক ফাঁক হয়ে দাঁড়ালে শয়তান প্রবেশ করে। তিনি বললেন, মুসল্লীরা তা শুনে না। আমি বললাম, আপনি ইমাম আপনার কথা শুনবে না কেন?

৪. এক ওয়াজ মাহফিলে, মদীনা হতে হিযরত করে আমাদের বরিশালে বসবাস করছেন তিনি মাহফিলের প্রধান বক্তা। তিনি দক্ষিণ বঙ্গের শ্রেষ্ঠ আলেম ও বক্তা। সকলে তাকে মাদানী বলে থাকেন। তিনি কুরআন হাতে নিয়ে ইসলাম সম্বন্ধে ও রাজনীতি সম্বন্ধে ওয়াজ করলেন। ওয়াজ শেষ করে 'ইশার সালাত আদায় করার জন্য দাঁড়ালেন, ইকামত শেষ হলে তিনি বললেন যে, আমি দুই রাকআত সালাত আদায় করে সালাত শেষ করব বাকি দুই রাকআত মুক্তাদিগণ দাঁড়িয়ে আদায় করবে। এক মুক্তাদি জিজ্ঞেস করলেন আমরা দাঁড়িয়ে কি পড়ব? তিনি বললেন কিছু পড়তে হবে না। সূরা আল ফাতিহাহ্ পড়তে যে সময় লাগে ততক্ষণ দাঁড়িয়ে রুকূ' সিজদাহ্ দিয়ে সালাত শেষ করবে। আমি তাঁর পিছনে ছিলাম। আমি উচ্চৈঃস্বরে বললাম সূরা আল ফাতিহাহ্ পড়তে হবে। তিনি কোনো কথা না বলে সালাত আদায় করলেন। তিনি সালাত শেষ করেও কিছু বলেননি। আমার এক বেয়াই আমাকে বললেন, বেয়াই আপনার খুবই সাহস, মাদানী সাহেব বললেন কিছু পড়তে হবে না আর আপনি বললেন সূরা আল ফাতিহাহ্ পড়তে হবে। আমি তাকে বুঝিয়ে দিলাম যে, সূরা আল ফাতিহাহ্ ইমাম মুক্তাদি সকলেরই পড়তে হয়। আর না পড়লে সালাত হয় না।

৫. একজন মাদ্রাসার সুপারিনটেন্ডে মাদ্রাসার শ্রেষ্ঠ শিক্ষক হিসাবে সরকারি পুরস্কার প্রাপ্ত জাঁদরেল ওয়ায়েজিন আমাদের বাড়ির পার্শ্বের বাড়ির মসজিদে মিলাদুন নবী দিবস উপলক্ষ্যে ওয়াজ করতে আসেন। আমি সেখানে উপস্থিত না হওয়ায় তিনি আমাকে লোক পাঠিয়ে তার সুললীত কণ্ঠের ওয়াজ শুনার জন্য উক্ত অনুষ্ঠানের সভাপতি নির্বাচন করেন। উদ্দেশ্য ছিল এই যে, আমি যেন সভা ত্যাগ করে চলে না যাই। আমি সভাপতির আসন গ্রহণ করে নিয়মতান্ত্রিকভাবে সভা পরিচালনার জন্য আদেশ দিলে সভার কার্য আরম্ভ হয়। উক্ত মাওলানা সাহেব ছিলেন প্রধান বক্তা। তিনি তার বক্তব্যে প্রচলিত দরূদগুলো পাঠ করে বললেন, মুহাম্মদ (ﷺ)-এর পিতা ছিলেন অত্যন্ত সুন্দর তাই তার সাথে বিবাহ বসার জন্য একশ' মহিলা অন্তরে অন্তরে ইচ্ছুক ছিল। কিন্তু আমেনা বিবির সাথে বিবাহ হওয়ায় ৯৯ জন মহিলা বক্ষ ফেটে মারা যায়। জন্মের পর মুহাম্মাদ (ﷺ) উম্মতি বলতে ছিলেন। তাঁকে প্রথম সৃষ্টি করে নক্ষত্র রূপে আকাশে লটকিয়ে রেখেছিলেন। তাঁকে সৃষ্টি না করলে কিছুই সৃষ্টি হত না। তিনি ছিলেন নূরের তৈরি। তাঁর নূর হতে সব কিছু সৃষ্টি করেছেন। তিনি মি'রাজে জুতা পরে গিয়েছিলেন। জুতা খুলতে চাইলে, আল্লাহ তা'আলা বললেন যে, জুতা খুলবেন না, কেননা তার জুতায় আরশে মুয়াল্লার সম্মান বেড়ে যাবে আর কত কি! তাঁর সুললীত কণ্ঠের ওয়াজ শুনে বিমহিত হয়েছিলেন শ্রোতাগণ। তারপর মিলাদ পড়লেন, ক্বিয়াম করলেন। তারপর মুনাজাত করবেন এমন সময় আমি বললাম, সভাপতি হিসাবে আমি কিছু বলব না? তিনি বললেন, সভাপতি সাহেব কিছু বলবেন। অমি কিছু বক্তব্য রেখে মাওলানা সাহেবকে বললাম, আপনি মিলাদ পড়লেন, ক্বিয়াম করলেন তা বিদআত ও শির্ক। আর যা কিছু বক্তব্য রাখলেন তা সহীহুল বুখারীতে এর ১টা শব্দও নেই। তিনি বললেন, শেষের দিকে আছে। আমি বললাম সহীহুল বুখারী আমার সব পড়া আছে, এগুলো নেই। তিনি বললেন, আমি দেখাবো, আমি বললাম, আপনি যদি দেখাতে পারেন তবে আমি খুশি হবো। কিন্তু দেখাতে পারবেন না। তারপরে অনেক বার তার সাথে সাক্ষাৎ হয়েছে। কিন্তু দেখাতে পারেননি; বরং আমি একদিন আমাদের মাদ্রাসার ছাত্র-ছাত্রীদেরকে কবিতার ছন্দে তাজবীদ শিক্ষা দিচ্ছিলাম এমন সময় তিনি যাচ্ছিলেন। তিনি আমাকে তার মাথায় একটু ফুঁ দিতে বলায় আমি তা দিয়েছিলাম বটে তাতে তার মাথা ঠাণ্ডা হয়েছিল কি-না তা জানতে পারিনি।

আমার জীবনে এ রকম ঘটনা অনেক ঘটেছে। তা লিখে শেষ করা যাবে না। তাই এসব বিষয়ের উপর আলোচনা এখানে শেষ করলাম।

﴿وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا﴾

অর্থ : "সত্য এসেছে এবং মিথ্যা বিলুপ্ত হয়েছে। মিথ্যা তো বিলুপ্ত হয়েই থাকে।"[৭৬]

আসিল সত্য ভাগিল মিথ্যা, মিথ্যা সদাই ভাগিয়া পড়ে।
উঠিল সূর্য মুদিল আঁখি, ঠুকিল পেঁচক আপন নীড়ে। ❑

[৭৬] *সূরা বানী ইসরাঈল : ৮১।*

ক্বাসাসুল হাদীস

খাব্বাব (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) ও পূর্ববর্তীদের দ্বীনের জন্য ত্যাগ

–গিয়াসুদ্দীন বিন আব্দুল মালেক*

মুহাম্মাদ (ﷺ) নামক এক ব্যক্তি নতুন দ্বীন প্রচার করছেন জানতে পেরে যুবক খাব্বাব (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) মুহাম্মাদুর রাসূল (ﷺ)-এর কাছে গেলেন, তাঁর মুখে আল কুরআনের বাণী শুনে মুগ্ধ হয়ে ইসলাম গ্রহণ করেন। খাব্বাব (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) প্রথম পাঁচ ছয়জনের পরেই ইসলাম গ্রহন করেন।

খাব্বাব (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) তাঁর ইসলাম গ্রহণের কথা গোপন রাখলেন না। নিঃসংকোচে অন্যদের কাছে দ্বীনের কথা বলা শুরু করেন। কয়েকদিনের মধ্যে এই খবর পৌঁছলো উম্মু আনমারের কাছে। উম্মু আনমার তার ভাই সিবা' ইবনু আব্দিল উযযা ও আরো কয়েকজনকে নিয়ে খাব্বাব (রাযিয়াল্লা-হু আনহু)'র কাছে এসে বলে, 'তুমি নাকি ধর্মত্যাগী হয়ে বানু হাশিমের এক যুবকের অনুসারী হয়েছ?'

তিনি বললেন, 'আমি ধর্মত্যাগী হইনি। তবে লা-শারিক আল্লাহর ওপর ঈমান এনেছি, মূর্তিপূজা ছেড়ে দিয়েছি এবং সাক্ষ্য দিয়েছি মুহাম্মদ (ﷺ) আল্লাহর বান্দা ও রাসূল।'

তাঁর কথা শেষ হতে না হতেই সিবা' ও তার সঙ্গীরা নেকড়ের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ে তাঁর ওপর। অনবরত কিল-ঘুষি মারতে থাকে, পা দিয়ে পিষতে থাকে।

একদিন খাব্বাব (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) আল্লাহর রাসূল (ﷺ)-এর সান্নিধ্য থেকে তাঁর কর্মস্থলে ফিরে আসেন। সেখানে ছিল একদল লোক। তারা যখন জানতে পেল খাব্বাব রাসূল (ﷺ)-এর নিকট থেকে এসেছেন, তারা তাঁকে মারতে শুরু করে। কিছুক্ষণের মধ্যেই তিনি জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন। জ্ঞান ফিরে এলে দেখেন তাঁর দেহ ক্ষত-বিক্ষত এবং পোষাক রক্তে-রঞ্জিত।

মক্কার মুশরিক নেতাদের নির্দেশে সিবা' ইবনু আব্দিল উযযা ও তার সাথীরা খাব্বাব (রাযিয়াল্লা-হু আনহু)-কে লোহার পোষাক পরিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা রোদে দাঁড় করিয়ে রেখে শাস্তি দিতে থাকে। প্রচণ্ড গরমে তিনি কাতর হয়ে পড়তেন, পিপাসায় ছটফট করতেন।

এই অবস্থায় তাঁকে বলা হতো, 'মুহাম্মাদ সম্পর্কে এখন তোমার বক্তব্য কী?'

দৃঢ় কণ্ঠে তিনি বলতেন, 'তিনি আল্লাহর বান্দা ও রাসূল। অন্ধকার থেকে আলোর দিকে নেওয়ার জন্য তিনি আমাদের নিকট এসেছেন।' আবারো শুরু হতো মারপিট।

ইসলাম গ্রহণ করার অপরাধে তার মনিব উম্মে আনমারের ভাইয়েরা তাকে অকথ্য নির্যাতন করত। তারা হাপরে কতকগুলো পাথর টুকরো গরম করে সেইগুলো বিছিয়ে এবং উত্তপ্ত আগুন তৈরি করে তার ওপর তাঁকে শুইয়ে দিত এবং একজন বলবান ব্যক্তি তাঁর বুকের ওপর পা রেখে দাঁড়িয়ে থাকত। এই উত্তপ্ত পাথর ও জলন্ত কয়লার আগুনে তাঁর পিঠের গোশ্ত খসে পড়ত, শরীরের রক্ত মাংসগুলো গলে গলে কয়লা ঠাণ্ডা হয়ে যেত। কয়লার আগুনে ঝলসে গিয়ে তার শরীরে এমন গর্ত হয়েছিল যে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত সেই গর্তগুলো পূরণ হয়নি। সেজন্য তিনি সব সময় গায়ের ওপর চাদর জড়িয়ে রাখতেন। মাঝে-মধ্যে উম্মু আনমার দোকানে এসে হাপরে লোহার পাত গরম করে তাঁর মাথায় ঠেসে ধরত, যন্ত্রণায় তিনি ছটফট করতেন, জ্ঞান হারিয়ে ফেলতেন। এত নির্যাতনের পরেও তিনি ইসলাম ত্যাগ করে ফিরে যেতে রাজি হননি।

খাববাব ইবনু আরত্ (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা নবী (ﷺ)-এর খেদমতে অভিযোগ করলাম। তখন তিনি তাঁর চাদরকে বালিশ বানিয়ে কা'বা শরীফের ছায়ায় বিশ্রাম করছিলেন। আমরা তাঁকে বললাম, আপনি কি আমাদের জন্য সাহায্য প্রার্থনা করবেন না? আপনি কি আমাদের জন্য আল্লাহর নিকট দু'আ করবেন না? তিনি বললেন, তোমাদের আগের লোকদের অবস্থা ছিল এই, তাদের জন্য মাটিতে গর্ত খুঁড়া হত এবং ঐ গর্তে তাকে পুঁতে রেখে করাত দিয়ে

* *প্রভাষক- সিটি মডেল কলেজ, জুরাইন, ঢাকা।*

তার মাথা দ্বিখণ্ডিত করা হত। এটা তাদেরকে দ্বীন হতে টলাতে পারত না। লোহার চিরুনী দিয়ে শরীরের হাড় মাংস ও শিরা-উপশিরা সব কিছু ছিন্নভিন্ন করে দিত। এটা তাদেরকে দ্বীন হতে সরাতে পারেনি। আল্লাহর কসম! আল্লাহ এ দ্বীনকে অবশ্যই পূর্ণতা দান করবেন। তখন একজন উষ্ট্রারোহী সান'আ হতে হাযারামাউত পর্যন্ত সফর করবে, আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকেও ভয় করবে না। অথবা তার মেষপালের জন্য নেকড়ে বাঘের ভয়ও করবে না। কিন্তু তোমরা তাড়াহুড়া করছ।[৭৭]

নারী-পুরুষ নির্বিশেষে প্রত্যেক সাহাবীকেই চরম নির্যাতনের ভেতর দিয়ে নিজ দীন ও ঈমান রক্ষা করতে হচ্ছিল। খাদ্যকষ্ট, পোশাকের অভাব, মান-সম্মানের উপর আঘাত, শারীরিক নির্যাতন সবকিছুই তারা বরদাশত করে যাচ্ছিলেন। একপর্যায়ে খাব্বাব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) নবী কারীম (ﷺ)-এর কাছে দু'আর আবেদন জানালেন। এ আবেদন জানানো নির্যাতনে অতিষ্ঠ হয়ে নয়। তাঁরা সমস্ত নির্যাতন সন্তুষ্টি চিত্তেই মেনে নিয়েছিলেন। এমনকি তাঁদের কোনও কোনও অমুসলিম আত্মীয় তাদেরকে আশ্রয় দিতে চাইলে তাঁরা তা প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। আল্লাহর পথে নির্যাতনভোগ এবং নবী কারীম (ﷺ)-এর সংগে থেকে যুল্ম-নির্যাতন ভাগাভাগি করে নিতে পারাকে তাঁরা নিজেদের জন্য সৌভাগ্যের বিষয় বলেই মনে করতেন। সুতরাং তাদের অভিযোগ আদৌ অধৈর্য ও অস্থিরতার কারণে নয়; বরং তাঁরা মনে করেছিলেন, জীবনে নিরাপত্তা লাভ হলে 'ইবাদত-বন্দেগীতে অধিকতর মনোযোগী হতে পারবেন এবং ইসলামের দাওয়াত ও প্রচারকার্যে সময় দিতে পারবেন। কিন্তু নবী কারীম (ﷺ) তাঁর সে আবেদন কবুল না করে; বরং সবরের উপদেশ দিলেন। কেননা এটা ছিল ইসলামের প্রথম যামানা। সাহাবায়ে কিরাম ছিলেন মুষ্টিমেয়। এই মুষ্টিমেয় সাহাবায়ে কিরামের জন্যই আগামী দিনের ইসলাম প্রচার ও মুসলিম উম্মাহকে পরিচালনার দায়িত্বভার বরাদ্দ ছিল। তাই নবী কারীম (ﷺ) তাদেরকে সেই দায়িত্বভার বহনের উপযুক্ত করে গড়ে তুলতে চাচ্ছিলেন। জ্ঞানের গভীরতা, অভিজ্ঞতার সমৃদ্ধি, হিম্মতের উচ্চতা ও সহাশক্তির দৃঢ়তা সবদিক থেকেই তারা যাতে পরিপূর্ণতা লাভ করতে পারেন, সেই প্রশিক্ষণ তাদের দিয়ে যাচ্ছিলেন। এজন্য তাদের যতদূর পৌঁছার ছিল, এখনও সেখানে পৌঁছা হয়নি। পথ আরও বাকি রয়েছে। তাদেরকে আরও ধৈর্য ধরতে হবে। সবরের অগ্নিপরীক্ষার সকল মাত্রা পূর্ণ করতে হবে। তা যাতে তারা করতে পারেন, তাই তাদের মনোবল জাগানোর জন্য প্রিয়নবী (ﷺ) পূর্ববর্তীদের দৃষ্টান্ত টেনে আনলেন। দীনের পথে তাঁদেরকে কত কষ্ট করতে হয়েছিল, সে কাহিনী তাদের শোনালেন।

'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু)'র খিলাফতের সময় তিনি খাব্বাব (রাযিয়াল্লাহু আনহু)'র উপর নির্যাতনের বিস্তারিত জানতে চাইলে খাব্বাব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, 'আমার কোমরের প্রতি লক্ষ্য করুন।' 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তাঁর কোমর দেখে বলেন, 'হায় একি অবস্থা!' তখন খাব্বাব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, 'আমাকে জ্বলন্ত অঙ্গারের উপর শুইয়ে ধরে রাখা হত, ফলে আমার চর্বি এবং রক্ত প্রবাহিত হয়ে আগুন নিভে যেত।

আল্লাহ তা'আলা মুসলিম উম্মাহকে খাব্বাবের মতো ইস্পাতসম দৃঢ় মনোবল ও ইসলামের জন্য যাবতীয় ত্যাগ ও বিসর্জন দেয়ার তাওফীক্ব দান করুন –আমীন। ❑

[৭৭] *সহীহুল বুখারী- হা. ৩৬১২।*

দু'আর আবেদন

সাপ্তাহিক আরাফাত সম্পাদক ও কেন্দ্রীয় জমঈয়তের সিনিয়র সেক্রেটারি জেনারেল শাইখ আবু আদেল মুহাম্মদ হারুন হুসাইন-এর মাতা বার্ধক্য জনিত জটিল রোগাক্রান্ত হয়ে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের তত্ত্বাবধানে চিকিৎসাধীন আছেন।

তাঁর আরোগ্য কামনা করে সকল মুসলিমকে দু'আ করার জন্য সনির্বন্ধ অনুরোধ করা যাচ্ছে।

মহান আরশের অধিপতি আল্লাহ তা'আলা তাকে সুস্থতা দান করুন –আমীন।

বিশেষ মাসায়িল

জিন্দের বসবাস কোথায়?

“রাসূল (ﷺ) তোমাদেরকে যা দিয়েছেন তা গ্রহণ করো, আর যা কিছু নিষেধ করেছেন তা বর্জন করো।” *(সূরা আল হাশর : ৭)*

আরাফাত ডেস্ক : কিছু লোক জিন্-এর বাস্তবতা অস্বীকার করার চেষ্টা করেছে। জিন্নের সম্বন্ধে কুরআনে একটি সম্পূর্ণ সূরা, সূরা আল জিন্ (৭২ নং সূরা) অবতীর্ণ হয়েছে। ক্রিয়াপদ জান্না, ইয়াজুন্নু : যেগুলোর অর্থ অন্তরালে রাখা, আত্মগোপন করা অথবা ছদ্মবেশে পরানো ইত্যাদি হতে প্রাপ্ত জিন্ শব্দের আক্ষরিক অর্থের উপর নির্ভর করে তারা দাবি করে যে, জিন্ হচ্ছে আসলে “চতুর বিদেশী”। অন্যেরা এমনও দাবী করে যে, যাদের মগজে কোনো মন নেই এবং স্বভাবে অগ্নি প্রকৃতির তারাই জিন্।

প্রকৃতপক্ষে জিন্ মহান আল্লাহর অপর একটি সৃষ্টি, যারা এই পৃথিবীতে মানুষের সঙ্গে সহ-অবস্থান করে। আল্লাহ তা‘আলা মানবজাতি সৃষ্টির পূর্বে জিন্ সৃষ্টি করেন এবং তিনি মানুষ সৃষ্টির উপাদান হতে ভিন্নতর উপদানের সমষ্টি দিয়ে জিন্ সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ তা‘আলা বলেন :

﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ ۞ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ﴾

“আমি তো মানুষ সৃষ্টি করেছি ছাঁচে-ঢালা শুষ্ক ঠনঠনে মৃত্তিকা হতে এবং এটার পূর্বে সৃষ্টি করেছি জিন্ অত্যুষ্ণ বায়ুর উত্তাপ হতে।”[৭৮]

তাদের নামকরণ করা হয়েছে জিন্, কারণ তারা মানবজাতির চোখের অন্তরালে রয়েছে। ইবলিশ (শয়তান) জিন্ জগতের, যদিও আল্লাহ তা‘আলা যখন আদম (আলাইহিস সালাম)-কে সাজদাহ্ করার হুকুম দিয়েছিলেন তখন সে ফেরেশ্তাদের মধ্যে অবস্থান করছিল। যখন সে সাজদাহ্ করতে অসম্মত হলো এবং তাকে তার অবাধ্যতার কারণ জিজ্ঞেস করা হলো। যে সম্পর্কে আল্লাহ তা‘আলা বলেন :

﴿قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ﴾

“সে বলল : আমি তার চেয়ে উত্তম, আপনি আমাকে আগুনের দ্বারা সৃষ্টি করেছেন, আর তাকে সৃষ্টি করেছেন মাটির দ্বারা।”[৭৯]

‘আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বর্ণনা দেন যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন : “ফেরেশ্তাদের আলো হতে সৃষ্টি করা হয়েছিল এবং জিন্দের ধুম্রবিহীন অগ্নি হতে।”[৮০]

আল্লাহ তা‘আলা আরও বলেন :

﴿وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ﴾

“এবং স্মরণ করো, আমি যখন ফেরেশ্তাগণকে বলেছিলাম আদমের প্রতি সাজদাহ্ করো, তখন সকলেই সাজদাহ্ করল ইবলীস ব্যতীত, সে জিন্দের একজন।”[৮১]

সুতরাং তাকে প্রত্যাখ্যাত ফেরেশ্তা অথবা ফেরেশ্তাদের একজন মনে করা ভুল হবে। জিন্দের অস্তিত্বের পরিপ্রেক্ষিতে সাধারণতঃ তাদেরকে তিন শ্রেণিতে ভাগ করা যেতে পারে।

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন, “তিন রকম জিন্ আছে– এক রকম যারা সারাক্ষণ আকাশে উড়ে, অন্য আর এক রকম যারা সাপ এবং কুকুর হিসাবে বিদ্যমান এবং পৃথিবীর উপর বসবাসকারী আর এক রকম যারা একস্থানে বাস করে অথবা উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘুরে বেড়ায়।”[৮২]

বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করে জিন্দের আবার দুই শ্রেণিতে বিভক্ত করা যায় : মুসলিম (বিশ্বাসীগণ) এবং কাফির (অবিশ্বাসীগণ)। আল্লাহ তা‘আলা সূরা আল জিন্ এ বিশ্বাসী জিন্দের সম্বন্ধে বলেন :

﴿قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا ۞ يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَنْ نُشْرِكَ بِرَبِّنَا

---

[৭৮] *সূরা আল হিজ্র : ২৬, ২৭।*

[৭৯] *সূরা সাদ : ৭৬।*

[৮০] *সহীহ মুসলিম কর্তৃক সংগৃহীত Sahih Muslim- English Trans, vol. 4 p. 1540, no. 7134।*

[৮১] *সূরা আল কাহ্ফ : ৫০।*

[৮২] *আত্ তাবারী এবং আল হাকিম কর্তৃক সংগৃহিত।*

أَحَدًا ۞ وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا ۞ وَأَنَّهُ كَانَ يَقُوْلُ سَفِيْهُنَا عَلَى اللهِ شَطَطًا﴾

"বলো, আমার প্রতি প্রেরিত হয়েছে যে, জিন্দের একটি দল মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করেছে এবং বলেছে, আমারা তো এক বিস্ময়কর কুরআন শ্রবণ করেছি। যা সঠিক পথ-নির্দেশ করে; ফলে আমরা এতে বিশ্বাস স্থাপন করেছি। আমরা কখনও আমাদের প্রতিপালকের কোনো শরীক স্থির করব না এবং নিশ্চয়ই সমুচ্চ আমাদের প্রতিপালকের মর্যাদা, তিনি গ্রহণ করেন না কোনো পত্নী এবং না কোনো সন্তান এবং যে আমাদের মধ্যকার নির্বোধরা আল্লাহর সম্বন্ধে অতি অবাস্তব উক্তি করত।"[৮৩]

﴿وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُوْنَ وَمِنَّا الْقَاسِطُوْنَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا ۞ وَأَمَّا الْقَاسِطُوْنَ فَكَانُوْا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا﴾

"আমাদের কতক আত্মসমর্পণকারী এবং কতক সীমালংঘনকারী; যারা আত্মসমর্পণ করে তারা সুচিন্তিতভাবে সত্য পথ বেছে নেয়। অপরপক্ষে, সীমালংঘনকারী তো জাহান্নামেরই ইন্ধন।"[৮৪]

জিন্দের মধ্যে অবিশ্বাসীদের বিভিন্ন নামে উল্লেখ করা হয় : ইফরিত্, শয়তান, ক্বারিন, অশুভ আত্মা, আত্মা, ভুতপ্রেত ইত্যাদি। তারা বিভিন্নভাবে মানুষকে ভুল পথে চালিত করার চেষ্টা করে। যারাই তাদের কথা শুনে এবং তাদের জন্য কাজ করে তাদেরকেই মানব শয়তান বলে উল্লেখ করা হয়। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন :

﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِيْنَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ﴾

"এইরূপে মানব ও জিনের মধ্যে শয়তানদেরকে প্রত্যেক নবীর শত্রু করেছি।"[৮৫]

প্রত্যেক মানুষের সঙ্গে স্বতন্ত্র একজন করে জিন্ রয়েছে যাকে ক্বারিন (সঙ্গী) বলা হয়। এটা মানুষের এই জীবনের পরীক্ষার অংশ বিশেষ। জিন্টি তাকে সর্বদা অবমাননাকর কামনা-বাসনায় উৎসাহিত করে এবং সার্বক্ষণিকভাবে তাকে ন্যায়-নিষ্ঠা হতে অন্যদিকে সরিয়ে নেবার চেষ্টা করে। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এই সম্পর্কে এভাবে বর্ণনা দিয়েছেন, "তোমাদের প্রত্যেককে জিন্দের মধ্য হতে একজন সঙ্গী দেয়া হয়েছে।" সাহাবাগণ জিজ্ঞাসা করলেন : "এমনকি আপনাকেও ইয়া রাসূলাল্লাহ? তিনি বললেন : এখন সে আমাকে শুধু ভালো করতে বলে।"[৮৬]

﴿وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُوْدُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوْزَعُوْنَ﴾

"সুলায়মানের সম্মুখে সমবেত করা হলো তার বাহিনীকে– জিন্, মানুষ ও বিহংগকুলকে এবং তাদেরকে বিন্যস্ত করা হলো বিভিন্ন ব্যূহে।"[৮৭]

কিন্তু অন্য কাউকে এই ক্ষমতা প্রদান করা হয়নি। অন্য কাউকে জিন্ নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা দেয়া হয়নি এবং কেউ পারেও না।

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : "إِنَّ عِفْرِيتًا مِنَ الْجِنِّ جَعَلَ يَفْتِكُ عَلَيَّ الْبَارِحَةَ، لِيَقْطَعَ عَلَيَّ الصَّلَاةَ، وَإِنَّ اللهَ أَمْكَنَنِيْ مِنْهُ فَذَعَتُّهُ، فَلَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَرْبِطَهُ إِلَى جَنْبِ سَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِيْ الْمَسْجِدِ، حَتَّى تُصْبِحُوْا تَنْظُرُوْنَ إِلَيْهِ أَجْمَعُوْنَ - أَوْ كُلُّكُمْ- ثُمَّ ذَكَرْتُ قَوْلَ أَخِيْ سُلَيْمَانَ : ﴿رَبِّ اغْفِرْ لِيْ وَهَبْ لِيْ مُلْكًا لَا يَنْبَغِيْ لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِيْ﴾- (سورة ص ٣٨ : ٣٥).

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন : যথার্থই গত রাতে জিন্দের মধ্য হতে একজন ইফরিত (একটি বলিষ্ঠ অথবা খারাপ জিন্) আমার সালাত ভেঙ্গে দেবার জন্য থু থু নিক্ষেপ করেছিল। যাহোক আল্লাহ তা'আলা তাকে পরাভূত করতে আমাকে সাহায্য করেন এবং যাতে তোমরা সকালে তাকে দেখতে পারো সে জন্য তাকে আমি মাসজিদের একটি স্তম্ভের সঙ্গে বেঁধে রাখতে চেয়েছিলাম। অতঃপর আমার ভ্রাতা সুলাইমানের দু'আ মনে পড়ল : 'হে আমার রব! আমাকে ক্ষমা করো এবং আমাকে দান করো এমন এক রাজ্য যার অধিকারী আমি ছাড়া কেউ না হয়।'"[৮৮]

মানুষ জিন্কে নিয়ন্ত্রণে আনতে সক্ষম নয় কারণ এই বিশেষ অলৌকিক ক্ষমতা শুধু পয়গম্বর সুলায়মানকে দেয়া হয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে, আসর অথবা ঘটনাক্রম

[৮৩] *সূরা আল জিন্ : ১-৪।*
[৮৪] *সূরা আল জিন্ : ১৪-১৫।*
[৮৫] *সূরা আল আন'আম : ১১২।*
[৮৬] *সহীহ মুসলিম কর্তৃক সংগৃহীত Sahih Muslim- enlgish trans, vol. 4, p.1540, no. 7134।*
[৮৭] *সূরা আন্ নাম্ল : ১৭।*
[৮৮] *সূরা সাদ : ৩৫; মুসলিম- মা. শা., হা. ৩৯/৫৪১।*

ছাড়া জিন্দের সাথে যোগাযোগ হওয়া বেশিরভাগ সময়ই নিষিদ্ধ বা ধর্মদ্রোহী কাজের মাধ্যমেই হয়।[৮৯]

এভাবে তলব করে আনা দুষ্ট জিন্ তাদের সঙ্গীদের গুনাহ করতে এবং স্রষ্টাকে অবিশ্বাস করতে সাহায্য করতে পারে। তাদের লক্ষ্য হলো স্রষ্টা ছাড়া অথবা স্রষ্টার পাশাপাশি অন্যকে উপাসনা করার মতো গুরুতর গুনাহ করতে যত বেশিজনকে পারা যায় ততজনকে আকৃষ্ট করে। একবার গণকদের সঙ্গে যোগাযোগ এবং চুক্তি হয়ে গেলে, জিন্ ভবিষ্যতের সামান্য কিছু গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা জানাতে পারে। রাসূল (ﷺ) বর্ণনা দিয়েছেন জিন্রা কিভাবে ভবিষ্যত সম্বন্ধে সংবাদ সংগ্রহ করে। তিনি বর্ণনা দেন যে, জিন্রা প্রথম আসমানের উপর অংশ পর্যন্ত ভ্রমণ করত এবং ভবিষ্যতের উপর কিছু তথ্যাদি যা ফেরেশ্তারা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করত তা শুনতে সক্ষম হত। তারপর তারা পৃথিবীতে ফিরে এসে তাদের পরিচিত মানুষের কাছে ঐ তথ্যগুলো পরিবেশন করত।[৯০]

মুহাম্মদ (ﷺ)-এর নবুওত প্রাপ্তির পূর্ব পর্যন্ত এই ধরণের বহু ঘটনা সংঘটিত হত এবং গণকরা তাদের তথ্যপ্রদানে নির্ভুল ছিল। তারা রাজকীয় আদালতে আসন লাভ করতে সক্ষম হয়েছিল এবং প্রচুর জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। এমনকি পৃথিবীর কিছু অঞ্চলে তাদের পুজাও করা হত। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কর্তৃক ধর্ম প্রচার শুরু করার পর হতে অবস্থার পরিবর্তন হয়। আল্লাহ তা'আলা ফেরেশ্তাদের দিয়ে আসমানের নীচের এলাকা সতর্কতার সঙ্গে পাহারা দেবার ব্যবস্থা করলেন। তারপর হতে বেশিরভাগ জিন্দের উল্কা এবং ধাবমান নক্ষত্ররাজি দিয়ে তাড়িয়ে দেয়া হত। আল্লাহ তা'আলা এই বিস্ময়কর ঘটনা কুরআনের ভাষায় বর্ণনা করেছেন :

﴿وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا ۞ وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا﴾

"এবং আমরা চেয়েছিলাম আকাশের তথ্য সংগ্রহ করতে। কিন্তু আমরা দেখতে পেলাম কঠোর প্রহরী ও উল্কাপিণ্ড দ্বারা আকাশ পরিপূর্ণ; আর পূর্বে আমরা আকাশের বিভিন্ন ঘাটিতে সংবাদ শুনার জন্য বসতাম। কিন্তু এখন কেউ সংবাদ শুনতে চাইলে সে তার উপর নিক্ষেপের জন্য প্রস্তুত জলন্ত উল্কাপিণ্ডের সম্মুখীন হয়।"[৯১] আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন :

﴿وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ ۞ إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ﴾

"প্রত্যেক অভিশপ্ত শয়তান হতে আমি তাকে রক্ষা করে থাকি; আর কেউ চুরি করে সংবাদ শুনতে চাইলে তার পশ্চাদ্ধাবন করে প্রদীপ্ত শিখা।"[৯২]

ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, যখন রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এবং তাঁর একদল সাহাবা উকাধ বাজারের দিকে রওয়ানা হলেন, তখন শয়তানদের আসমানী খবরা-খবর শুনায় বাধা প্রদান করা হলো। উল্কাপিণ্ড তাদের উপর ছেড়ে দেয়া হলো। ফলে তারা তাদের লোকদের কাছে ফিরে এলো। যখন তাদের লোকরা জিজ্ঞাসা করল– কি হয়েছিল? তারা তাদের জানাল, কেউ কেউ পরামর্শ দিলো যে, নিশ্চয়ই কিছু ঘটেছে, কাজেই তারা কারণ খুঁজে বের করার জন্য পৃথিবীর চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল। তাদের কয়েকজন রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এবং তাঁর সাহাবাগণের সালাতরত অবস্থা দেখতে পেল এবং তারা তাদের কুরআন পড়া শুনল। তারা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করল যে, নিশ্চয় এটাই তাদের শুনায় বাধা প্রদান করেছিল। যখন তারা তাদের লোকদের মধ্যে ফিরে গেল তখন তারা বলল,

﴿قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا ۞ يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَنْ نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا﴾

"আমরা তো এক বিস্ময়কর কুরআন শ্রবণ করেছি। যা সঠিক পথ-নির্দেশ করে, ফলে আমরা এতে বিশ্বাস স্থাপন করেছি। আমরা কখনও আমাদের প্রতিপালকের কোনো শরীক স্থির করব না"[৯৩]।[৯৪]

---

[৮৯] *আবূ আমিনাহ বিলাল ফিলিপস্-এর Ibn Taymeeyah's Essay On The Jinn- রিয়াদ, তা. প্র., ১৯৮৯, পৃ. ২১।*

[৯০] *বুখারী এবং মুসলিম কর্তৃক সংগৃহীত Sahih Muslim- English trans, vol. 4, p. 1210, no. 5538।*

[৯১] *সূরা আল জিন্ : ৮-৯।*

[৯২] *সূরা আল হিজ্র : ১৭-১৮।*

[৯৩] *সূরা আল জিন্ : ১-২।*

[৯৪] *বুখারী, মুসলিম, আত্ তিরমিযী এবং মুসনাদ আহমদ কর্তৃক সংগৃহীত, Sahih Al-Bukhari- Arabic-English, vol. 6, pp. 415-6. no. 443 and Sahih Muslim- English trans, vol. 1, pp. 243-44, No. 908।*

এইভাবে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কর্তৃক ধর্ম প্রচারের পূর্বে জিন্‌রা যেভাবে সহজে ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে খবরা-খবর সংগ্রহ করত তা আর পারেনি। ঐ কারণে তারা এখন তাদের খবরা-খবরের সঙ্গে অনেক মিথ্যা মিশ্রিত করে। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন, "জাদুকর অথবা গনকের মুখে না পৌঁছান পর্যন্ত তারা (জিন্‌রা) খবরা-খবর নীচে ফেরত পাঠাতে থাকবে। কখনও কখনও তারা খবর চালান করার আগেই একটি উল্কা পিণ্ড তাদের আঘাত প্রাপ্ত করার পূর্বে পাঠাতে পারলে এর সঙ্গে তারা একশটা মিথ্যা যোগ করবে।[৯৫]

'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) তখন উল্লেখ করলেন যে গণকরা কখনও কখনও যা বলে সত্য হয়।

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন, "ওতে সত্যতার কিছু অংশ যা জিন্‌রা চুরি করে এবং তার বন্ধুর কাছে বলে কিন্তু সে এর সাথে একশটি মিথ্যা যোগ করে।"

'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বর্ণনা দেন যে তিনি আল্লাহর রাসূল (ﷺ)-এর কাছে গণকদের সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলে তিনি উত্তর দেন যে, ওরা কিছু না।[৯৬]

একদিন 'উমার ইবনু আল খাত্তাব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) যখন বসে ছিলেন তখন একটি সুদর্শন লোক তার পাশ দিয়ে চলে গেলে তিনি বললেন : আমার যদি ভুল না হয় লোকটি এখনও প্রাক ইসলামি ধর্ম অনুসরণ করছে অথবা বোধ হয় সে তাদের একজন গণক। তিনি লোকটিকে তার সামনে আনতে নির্দেশ দিলেন এবং তিনি তার অনুমান সম্পর্কে জিজ্ঞাস করলেন। লোকটি উত্তর দিলো, আমি আজকের মতো আর কোন দিন দেখিনি যেদিন মুসলিম এই ধরণের অভিযোগের সম্মুখীন হয়েছে। 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বললেন : অবশ্যই আমাকে তোমায় অবহিত করা উচিত। লোকটি তখন বলল, অজ্ঞতার যুগে আমি তাদের গণক ছিলাম। ঐ কথাশুনে 'উমার জিজ্ঞাসা করলেন : তোমার মহিলা জিন্ তোমাকে সব চেয়ে বিস্ময়কর কি বলেছে। লোকটি তখন বলল : একদিন আমি যখন বাজারে ছিলাম, সে (মহিলা জিন্) উদ্বিগ্ন হয়ে আমার কাছে এসেছিল এবং বলেছিল মর্যাদাহানি হবার পর তুমি কি জিন্‌দের হতাশাগ্রস্থ অবস্থায় দেখনি? তুমি কি দেখনি তাদেরকে (জিন্‌দেরকে) মাদী উট ও তাতে আরোহণকারীদের অনুসরণ করতে? 'উমার বাধাদানপূর্বক বললেন : এটা সত্য।[৯৭]

জিন্‌রা তাদের সাথে যোগাযোগ রক্ষাকারী মানুষকে আপতঃ ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে অবহিত করতে সক্ষম। উদাহরণস্বরূপ, যখন কেউ একজন গণকের কাছে আসে সে আসার আগে কি কি পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিল তা গণকের জিন্ আগত লোকটির ক্বারিনের (প্রত্যেক মানুষের সঙ্গে নিয়োজিত জিন্) কাছ থেকে জেনে নেয়। সুতরাং গণকলোকটিকে বলতে সক্ষম হয় যে সে এটা করবে অথবা অমুক অমুক জায়গায় যাবে। এই প্রক্রিয়ায় একজন সত্যিকার গণক অপরিচিত লোকের অতীত পরির্পূণভাবে জানতে সক্ষম হয়। সে একজন অচেনা ব্যক্তির পিতা-মাতার নাম, কোথায় জন্মগ্রহণ করেছিল এবং তার ছেলে বেলার আচরণ ইত্যাদি সম্বন্ধে বলতে সক্ষম হয়। অতীত সম্বন্ধে পরিপূর্ণ বর্ণনা দেবার ক্ষমতা, জিন্-এর সঙ্গে মুহূর্তের মধ্যে বহু দুরত্ব অতিক্রম করতে এবং গোপন বিষয়, হারানো জিনিস, অদেখা ঘটনাবলী সম্বন্ধে বহু তথ্যাদি সংগ্রহ করতেও সক্ষম। কুরআনে বর্ণিত পয়গম্বর সুলায়মান এবং সিবার রাণী বিলকিসের গল্পের মধ্যে এই ক্ষমতার সত্যতা পাওয়া যায়। যখন রাণী বিলকিসের গল্পে এলো, তিনি একটি জিন্‌কে রাণীর দেশ থেকে তার সিংহাসন নিয়ে আসতে বললেন।

﴿قَالَ عِفْرِيتٌ مِّنَ الْجِنِّ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَن تَقُومَ مِن مَّقَامِكَ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ﴾

"এক শক্তিশালী জিন্ বলল, আপনি আপনার স্থান হতে উঠার পূর্বে আমি তা এনে দিব এবং এই ব্যাপারে আমি অবশ্যই ক্ষমতাবান বিশ্বস্ত।"[৯৮] ***[ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম (রাহিমাহুল্লাহ)-এর রচনা অবলম্বনে]***

---

[৯৫] *বুখারী, মুসলিম এবং তিরমিযী কর্তৃক সংগৃহীত, Bukhari-Arabic-English, vol. 8, p. 150, No. 232।*

[৯৬] *বুখারী এবং মুসলিম কর্তৃক সংগৃহীত, Bukhari- Arabic-English, vol. 1, p. 439. No. 657 and Muslim- English trans, vol. 4, p. 1209, no. 5535।*

[৯৭] *সহীহুল বুখারী কর্তৃক সংগৃহীত, Sahih Al-Bukhari, Arabic-English, vol. 5, p. 131-2. no. 206।*

[৯৮] *সূরা আন্ নাম্‌ল : ৩৯।*

সমাজচিন্তা

শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড

–মো. আরফাতুর রহমান*

মেরুদণ্ড ছাড়া যেমন প্রাণী সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারে না, তেমনি শিক্ষা ছাড়া একটি জাতি আলোর মুখ দেখতে পারে না। শিক্ষাই পারে একটি মানুষের মনুষ্যত্ব, বিবেক, নৈতিক গুণাবলির বিকাশ সাধন, সৃজনশীল মেধাকে বিকশিত করা, বাস্তব জগৎ সম্পর্কে চিন্তাশীল ভাবনা ভাবতে সাহায্য করে। শিক্ষা আমাদের মূল্যবোধকে জাগ্রত করে, সমাজের কুসংস্কার, অনৈতিক কার্যকলাপ, অপসংস্কৃতি, বিকৃত চিন্তাধারাগুলোকে দূর করে। কিন্তু সে শিক্ষার পরিধি হতে হয় মহাকাশের মতো অসীম।

কিছুদিন আগেও পত্রিকা ঘাটলেই অনায়াসে কিছু শিরোনাম চোখে পড়তো, বইয়ের ভারে নুয়ে পড়ছে শিক্ষার্থীরা, বই ও পরীক্ষার চাপ কমাতে বললেন শিক্ষাবিদরা, দেশে জিপিএ-৫ বাড়লেও প্রকৃত শিক্ষার মান বাড়েনি ইত্যাদি ইত্যাদি। এগুলো দেখামাত্রই আমাদের ভিতরে চেতনার উদ্রেক হয়, শিক্ষা ব্যবস্থা কোন পথে হাঁটছে? শিক্ষা ব্যবস্থায় আদৌ স্বাচ্ছন্দ্য বজায় থাকছে কি! নানা প্রশ্ন মাথায় অনবরত ঘুরপাক খায়। আমরা চারদিকে খেয়াল করলেই স্পষ্টত দেখতে পাই, শিক্ষার্থীদের ওপর শিক্ষাটাকে চাপিয়ে দেয়া হচ্ছে। একটা শিশুর যখন পুতুল খেলার বয়স, বড়দের স্নেহ আদর পাওয়ার উপযুক্ত সময় তখন তাকে একপ্রকার বাধ্য করে স্কুলে পাঠানো হচ্ছে। এতে করে তার মানসিক বিকাশ ভীষণভাবে বাধাগ্রস্ত হচ্ছে এবং একাধারে শিক্ষারপ্রতি ভীতশ্রদ্ধ জন্মাচ্ছে। শুধু এটাতে সীমাবদ্ধ থাকলে কথা ছিল। এরপর রয়েছে বইয়ের চাপ। সরকারি স্কুল ব্যতিরেকে প্রিপারেটরি বা কিন্ডারগার্টেন স্কুলগুলোতে শিক্ষাবোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত বই ব্যতিরেকে আরো পাঁচ থেকে ছয়টা বই অতিরিক্ত পড়ানো হয় প্রাথমিক পর্যায়ে। আর মাধ্যমিক পর্যায় তো রয়েছে হোম ওয়ার্কের মতো জবরদস্তি কাজ। আর পরীক্ষার কথা না বললে নয়; সাপ্তাহিক, মাসিক, দ্বিমাসিক, ত্রৈমাসিক, ছয়মাসিক, বার্ষিক ইত্যাদি পরীক্ষা তাদের পিছু ছাড়ে না। এরপর তো রয়েছে পাবলিক পরীক্ষার চাপ। দশ বছর পেরুতে না পেরুতে তাকে বসতে হয় ক্রমান্বয়ে এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষায়। অর্থাৎ- একজন কোমলমতী শিক্ষার্থী যখন শারীরিক ও মানসিকভাবে বেড়ে ওঠার যথার্থ সময় তখন তাকে স্কুল-কলেজ, পরীক্ষা, কোচিং, হাউস টিউটর আর অমানুষিক পরিশ্রমের মধ্য দিয়ে সময়ের বৈতরণী পেরুতে হয়। অথচ আগে এমনটি ছিল না। এমনকি আমরাও এমন কঠোর নিয়ম-কানুন অনুসরণ করিনি। সকালে দুই-তিন ঘন্টা পড়েছি, তারপর স্কুল করেছি আর বিকালে হই-হুল্লোড়, খেলাধুলা আর রাতে আবার চার-পাঁচ ঘন্টা পড়েছি। প্রাইভেট পড়া তেমন লাগতোই না। শিক্ষকরা মোটামুটি ক্লাসের পড়া ক্লাসে করিয়ে দিতেন। আর লাগলেও বিকালে সময় করে গণিত আর ইংরেজিটা নিয়ে বন্ধু-বান্ধবের সাথে দলবেঁধে আনন্দ করে পাড়ায় যিনি ভালো পড়াতে পারেন তাঁর কাছ থেকে পড়ে আসতাম।

শিক্ষক কী দিলো আর মূল্যবান জীবন শেষ করে ছাত্র কী নিয়ে ঘরে ফিরলো দেশকে কী দিলো আগামীর পথ চলায় সে কী করবে, এসব বিষয় অভিভাবক ও শিক্ষকগণ সঠিক সময়ে ভাবছেন কী? না ভাবলে একটু ভাবতে হবে। ভাবুন, চিন্তা করুন। শিক্ষক হিসেবে শিক্ষার্থীকে কী দিচ্ছি। সে আমার কাছ থেকে কী শিখছে, আমি তাকে কী শিখাচ্ছি। একটু কি ভাবছি আমি, আপনি? তাহলে একটু সেকালের শিক্ষায় ফিরে যাই। আমরা যখন শিক্ষার্থী ছিলাম তখন শিক্ষার ধরন মান উন্নয়ন অগ্রগতি কেমন ছিল? আর আজকের স্বাধীনতার ৫২ বছরের মাথায় শিক্ষার মান উন্নয়ন ডেভেলাপ কেমন দেখছেন? তখন আর এখনের মধ্যে কোনো তফাৎ দেখছেন কি? নিশ্চয় বলবেন তফাৎ আছে, অনেক তফাৎ। তফাৎ কোথায়, তখনকার বিদ্যালয় হেঁটে স্কুলে যাওয়া আসা হতো। এখন বাসা থেকে দামি গারি ছাড়ে স্কুল গেইট পর্যন্ত। তখন পান্থাভাত আর ঝাল মরিচের তরকারি দিয়ে এক মুটো ভাত খেয়ে যাওয়া হতো স্কুলে। আর এখন সে জায়গায় দামি মাংস, পোলাও, নুডুলস, পিজ্জা, পাস্তা ইত্যাদি টিফিন। এ ধরনের অসংখ্য বিষয় লিখা যাবে, বলা যাবে। আজকের যারা মন্ত্রী, এমপি, রাষ্ট্রপতি ও সমাজে উচ্চ পদস্থ সবাই এভাবে শিক্ষাজীবন সমাপ্ত করে দেশ ও জাতির সেরা হয়েছে। এখনকার মতো এতোগুলো বই তখন ছিল না। ছিল না দামি ব্যাগ, খাতা, ল্যাপটপ আনুষঙ্গিক শিক্ষাক্রম। কিন্তু তারা শতভাগ সফল। তখনকার শিক্ষায় তৈরি হয়েছে বুদ্ধিজীবী, গবেষক, লেখক, নামি দামি যুগ শ্রেষ্ঠ মহামানব। না বললেই নয় দেশের বর্তমান ভার্সিটির যে সকল সিলেবাস পাঠদান করা হয়, তাদের সিংহভাগ সাহিত্যিক কবির শিক্ষা ও বেড়ে ওঠা সেভাবেই। আজকের ছাত্র-ছাত্রীরা ল্যাপটপ, এন্ড্রয়েড মোবাইল, দামি গাড়ি, এসিরুমে শিক্ষাজীবন সমাপ্ত করে কী অর্জন করছে তারা, সেটায় আমি আপনি ভাবছি। যারাই এখন শিক্ষক তারাই বা তখন কীভাবে শিক্ষার্থী ছিলেন, তাদের শিক্ষার্জনের মান কী ধরনের ছিল, সেটাও আমরা ভাবছি সময় ও প্রয়োজনের কারণে। তাহলে আজকের সম্মানিত শিক্ষক জাতি কী বলবেন? তাদের কাছে এসব বক্তব্যের সঠিক সমাধান কী হতে পারে! তখন ছাত্র-ছাত্রীরা স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে নৈতিক শিক্ষা পেতো।

* *লেখক, কলামিস্ট, শিক্ষক।*

ছাত্র-ছাত্রীরা পিতা, অভিভাবক, শিক্ষক-শিক্ষিকাদের ও সমাজের অন্যান্যদের সম্মান ইজ্জত করতো। নীতি ও নৈতিকতায় তারা সমাজের অনুসরণ যোগ্য ছিল। শিক্ষক, অভিভাবক ও ছাত্রদের মাঝে একটা সু-সম্পর্ক ছিল। আপদে-বিপদে একে অপরের ডাকে সাড়া দিতো। এসব কথা এখন সে সময়ের পুঁথি। তাহলে আমাদের ছাত্র-শিক্ষক-অভিভাবকদের নীতি নৈতিকতা কোথায় গেল? বিদ্যালয় কী শুধুমাত্র অর্থের বদলে একটা প্রিন্টেড কাগজ দেয়ার ঠিকানা। একটা কাগজের জন্যই কী সর্বোচ্চ বিদ্যাপিঠের দরকার। লাখ-কোটি অর্থকড়ি খরচ করে অভিভাবকগণ বিদ্যালয়ের নিকট কী তাই চায়? ছাত্রের প্রতি দায়িত্ববোধ, অভিভাবকদের প্রতি শিক্ষকদের কমিটম্যান্ট কী সেটা প্রথমে ঠিক করা দরকার। ছাত্র-ছাত্রীদের কী দিলাম আর অভিভাবকদের থেকে কী নিলাম এখন সময় হিসাব করে যোগ আর বিয়োগ করার। যদি তা করা না হয়, এ জাতির পচন অনিবার্য। পচন ধরেছে, এ পচনের মাধ্যমে সমাজ গভীর অনিশ্চিত অন্ধকারে ধাবিত হবে। শুধুমাত্র অর্থের উদ্দেশ্য শিক্ষা না হয়ে আদর্শনীতি নৈতিকতা সম্পন্ন মানুষ তৈরির কারখানা হিসেবে দেখতে চাই বিদ্যালয়কে। বিদ্যালয় থেকে জ্ঞানী-গুণী, বিদ্বান, শিক্ষাবিদ বের হোক। কোনো ছাত্র যুবককে কেউ যেন ভয় না পায়। যুবক ছাত্ররা যেন মানুষ ও সমাজের আদর্শ হয়। তাদের শিক্ষা ও গুণে সমাজ যেন আলোকিত হয় সেটা দেখার (শিখার) দায়িত্ব রাষ্ট্র ও বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের। প্রজন্ম ভালো হলে আগামী প্রজন্ম আরো উন্নত ও ভালো হবে। একে অপরের দেখাদেখির মাধ্যমে শিখবে ও গড়ে উঠবে। তবেই শিক্ষার সঠিক উদ্দেশ্য বাস্তবায়িত হবে।

আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার লক্ষ্য হওয়া উচিত শিক্ষার্থীর মেধা ও মননকে কীভাবে জাগিয়ে তোলা যায়। তাদেরকে তাদের মতো বেড়ে ওঠার জন্য একটা সুষ্ঠু পরিবেশ তৈরি করতে হবে। আজ এরকম সহনীয় ও স্বাচ্ছন্দ্যময় একটি শিক্ষার পরিবেশ ও ব্যবস্থার বড্ড প্রয়োজন। শিক্ষাব্যবস্থা এগুচ্ছে মন্থরগতিতে, বিংশ শতাব্দীর শুরুর যে পড়াশোনার ব্যবস্থা তা থেকে অনুপ্রেরণা নেওয়ার যথেষ্ট যৌক্তিকতা আছে বলে বিশ্বাস করা যেতে পারে। অনলাইন ভিত্তিক পড়াশোনা, পড়াশোনার সহজ প্রাপ্যতা, লৌকিকতা ইত্যাদির কারণে শিক্ষার্থীরা 'সাধনা' বিষয়টির সাথে পরিচিত হতে পারছে না, যে বিষয়টা এনালগ যুগে ছিল বলে আমরা জানি। আধুনিক পড়াশোনার ব্যবস্থা অপরিহার্য হওয়া সত্ত্বেও আমাদের লক্ষ্য রাখতে হবে 'সাধনায় পাঠগ্রহণ' হচ্ছে নাকি 'সংক্ষিপ্ত পথে সনদ অর্জন' হচ্ছে সর্বোপরি, 'বিশেষ বিবেচনায় পাস' কি-না। এই 'বিশেষ বিবেচনায় পাস' প্রজন্ম এনালগ যুগের 'বিশেষ বিবেচনায় প্রথম শ্রেণিতে প্রথম' প্রজন্মের মতো জাতি বিনাশের ক্ষমতা না রাখলেও আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থার সুস্থ-স্বাভাবিক সংস্কৃতি দেশে কতটুকু বিরাজমান তা উপলব্ধি করা শিক্ষা-বাজেট প্রণয়নের চাইতে গুরুত্বপূর্ণ।

শিক্ষাকে বাণিজ্যকরণ বন্ধ করতে হবে। নীতি নৈতিকতা, ধর্মীয় মূল্যবোধের অনুশীলন চর্চা হোক। পশুত্ব আর দাসত্বের যথার্থ বিতাড়ন ও নিরসন হোক। মানবীয় মূল্যবোধের বিকাশ ঘটাতে হবে শিক্ষা নামক ফ্যাক্টরিতে। প্রকৃত 'ইল্‌মের চর্চা অনুশীলন থাকতে হবে। শিক্ষক, অভিভাবক সমাজের প্রতি শিক্ষার্থীর দায়িত্ববোধ জাগ্রত করতে আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। জ্ঞান ও বিজ্ঞানকে সমাজ ও মানুষের জন্য বিতরণ করতে হবে। সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রতি দায়িত্ব ও যত্নবান হতে হবে। জন্মভূমি-মাতৃভূমির প্রতি দরদ, ভালোবাসায় উজ্জীবিত হতে হবে। চেতনায় স্বদেশপ্রেম থাকতে হবে। শিক্ষায় দীক্ষায় আলোকিত হয়ে মাতৃভূমি ও সমাজের প্রতি অর্পিত দায়িত্ব পালনে মাতৃভূমির অধিকার ও অঙ্গীকার পূরণ করতে হবে। আচার আচরণে মানবীয় গুণাগুণ শিক্ষার পাশাপাশি জাগ্রত হতে হবে। সে কালের শিক্ষায় মানবীয় ধর্মীয় গুণাবলীর সম্ভার ছিল। আজকালের শিক্ষায় শিক্ষক শিক্ষার্থী সকলেই মানবীয় গুণাবলীর বাইরে চলে যাচ্ছি বলে মনে হয়। আত্মকেন্দ্রিক শিক্ষা নয়, সমাজ-পরিবার-রাষ্ট্রের উন্নয়নে শিক্ষাকে আরো প্রাতিষ্ঠানিক করে তুলতে হবে। নিজ নিজ ধর্মের মূল্যবান বাণীর চর্চা অনুশীলন শিক্ষার সর্বস্তরে বাস্তবায়ন চাই।

আসুন! সকলে মিলে শিক্ষার আলো সর্বস্তরে বাস্তবায়ন করি। সকলে মিলেমিশে শিক্ষাকে জাতি গঠনের মূল উদ্দেশ্য হিসেবে গ্রহণ করি। শিক্ষাকে পণ্য হিসেবে বেচাবিক্রি থেকে বিরত থাকি। মানুষ তৈরির কারিগর শিক্ষক মহোদয় ও সচেতন অভিভাবকদের এখনই এসব বিষয়ে ভাবা ও এগিয়ে আসা দরকার।

শিক্ষাকে মানসম্মত করতে হলে শিক্ষার্থীদের মেধা ও মননশীলতার সাথে যোগসাজশ করে শিক্ষাকাঠামো সাজাতে হবে। মনে রাখতে হবে, পাসের হার বা পদ্ধতিগত পরিবর্তনে শিক্ষার মান বাড়ে না; গুণগত পরিবর্তন জরুরি। আর এ লক্ষ্যে যা যা করা দরকার তা অতিদ্রুত করতে হবে। যেমন- শিক্ষামন্ত্রণালয়কে আরো কার্যকরী ভূমিকা রাখতে হবে, কারিকুলামের সাথে সমন্বয় করে শিক্ষকদেরকে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ দিতে হবে এবং মোটের ওপর একটা মানবিক, সহনীয় ও স্বাচ্ছন্দ্যময় সার্বজনীন শিক্ষার অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে।

বাঙালি জাতির দায়িত্ব যারা নিয়েছেন তাদের উচিত, যে শিক্ষার মাধ্যমে জাতি নিজের সত্তাকে বাঁচিয়ে রাখবে, সে শিক্ষা যেন কোনোভাবেই ব্যবসায়ীদের হাতে চলে না যায়। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে যেন শিক্ষার মান অক্ষুণ্ন থাকে, সে দিকে কড়া নজর দিলে আগামীর প্রজন্ম আমাদের এই দেশকে উপহার দেবে নতুন কোনো ইতিহাস ও দেশকে নিয়ে যাবে অনন্য এক উচ্চতায়। আশাবাদী মানুষ হিসেবে শিক্ষা ব্যবস্থার আলোকিত সুস্থ দিন প্রত্যাশা করছি। ❑

আত্মগঠন

নতুন উদ্যমে শুরু হোক তারুণ্যের ভবিষ্যৎ

–মো. শাওন রহমান*

অনেক প্রাপ্তি ও অপ্রাপ্তিকে সঙ্গী করে জীবনের চাকা চলমান থাকে। প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তির অঙ্ক মেলাতে গেলে হিসাবের খাতায় যোগ-বিয়োগের পাল্লাটা অনেক ফারাক। সংশয়, সংকট, উদ্বেগ কাটিয়ে উঠে নতুন ভাবনা নতুন আশায় নতুন করে বাসা বাঁধে প্রতিটি মানুষ হৃদয়ে। তরুণরা আগামী দিনের কর্ণধার। যারা নিজ প্রতিভায়, উদ্যমে, কর্মযজ্ঞে বদলে দেয় পৃথিবীতে তারাই তো চিরনবীণ। তাদের উদ্যমী শক্তিই হতে পারে নতুন দিনের প্রত্যাশার আলো।

তারুণ্য মানে না কোনো নিষেধ-বাধা। তারুণ্যের উদ্দামতা সাগর পাড়ি দেয়ার মতো দুঃসাহস যেমন রাখে, ঠিক তেমনি এ বয়সে হিমালয় পর্বত জয় করার মতো দুঃসাহস রাখে। জল, স্থল, আকাশ, মহাকাশ, পর্বত কোথায় নেই তারুণ্যের ছাপ। যেখানেই চোখ পড়বে তারুণ্যের জয়গান। বর্তমানে আধুনিকতার ছোঁয়ায় আমরা উন্নত থেকে উন্নততর অবস্থানে যাচ্ছি, অন্যদিকে তরুণদের নৈতিক অবক্ষয় মারাত্মকভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। যারা পৃথিবীর মেরুদন্ড, তাদের যখন নৈতিকতায় ঘাটতি দেখা দেবে, মূল্যবোধের অবক্ষয় ঘটবে সেটি কিন্তু পৃথিবীর জন্য অশনি সংকেত। এটি অব্যাহত থাকলে ভীষণ সংকটময় কাল দেখা দিতে পারে। যেটা থেকে আমাদের পরিত্রাণ পেতে হলে অনেক কষ্ট করতে হবে। এই যে অশনি সংকেত, এটি যে শুধু তরুণদের ক্ষতি করবে তা নয়, গোটা মানবজাতির জন্য ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়াবে। যেহেতু পরিবর্তনটা তারাই নিয়ে আসছে, তাদের ক্ষেত্রে পরিবর্তনটা যদি ইতিবাচক না হয়ে নেতিবাচক হয়, তাহলে এটি পুরো বিশ্বের জন্যই ধাক্কা। একজন তরুণের নৈতিকতার ঘাটতি থাকায় তারা যেসব অসামাজিক কার্যকলাপ করে এর প্রধান কারণ হলো সে পুঁথিগত শিক্ষাটা প্রতিষ্ঠান থেকে ঠিকই নেয়, কিন্তু সুশিক্ষাটা সে নিতে পারে না এবং জীবনের যে শিক্ষা ও দর্শন, সেখান থেকে সে ছিটকে পড়ে। সুশিক্ষা এমন বিষয় যা মানুষকে রুপা বা স্বর্ণ থেকে হীরায় পরিণত করে। এ সুশিক্ষা সবাই নিতে পারে না, কারণ সুশিক্ষিত মানুষ মানেই স্বশিক্ষিত। সুশিক্ষা পেলে তার নৈতিক অবক্ষয় ঘটবে না। এর অভাবেই অবক্ষয় ঘটছে। তারপর নিরক্ষর কিছু মানুষ থাকে, যারা শুধু হয়তো স্বাক্ষর করতে পারে বা অল্প একটু পড়তে পারে, তাদের আসলে আমরা শিক্ষিত বলতে পারি না। এ রকম ৪০ শতাংশ মানুষ আছে আমাদের। এক্ষেত্রে দেখা যায় তাদের শিক্ষার দৈনতার কারণে সে কিছুই জানে না। না জেনেই অসামাজিক ও অনৈতিক কার্যকলাপ করে থাকে। এটি আমাদের জন্য বড় একটি ধাক্কা।

তরুণদের সঠিক পথে পরিচালিত করতে হলে এ নিরক্ষরতা দূর করা জরুরি। তারপর যেটি দেখা যায়, তরুণদের নৈতিক অবক্ষয়ের অন্যতম একটি কারণ হচ্ছে সম্মানজনক পেশায় না যেতে পারা। তারা যখন স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বের হয়, তখন তার এমন এক ধরনের চেতনাবোধ তৈরি হয় যে বাংলাদেশের সর্বোচ্চ চাকরি সে পাবে বা পৃথিবীতে সে সর্বোচ্চ পর্যায়ে যাবে। কিন্তু অনেক সময় দেখা যায়, আশার সঙ্গে কাজের মিল হয় না। যেহেতু আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে অনেক ত্রুটি থাকে। এক্ষেত্রে দেখা যায় তরুণরা নিজেদের সঠিক জায়গায় প্রতিষ্ঠিত করতে পারেনি বিধায় হতাশ হয়ে পড়ে। এ হতাশা, উদ্বিগ্নতা তাকে মাদকাসক্তির দিকে ধাবিত করে। এতে সে অনেক সময় অসামাজিক কার্যকলাপে জড়িয়ে পড়ে। এদিকে তরুণ সমাজের মধ্যে অপসংস্কৃতির প্রভাব রয়েছে। দেশীয় সুস্থ, সুন্দর সংস্কৃতির পরিবর্তে জাঁকজমকপূর্ণ অপসংস্কৃতি দেখে তরুণরা তার দিকে বেশি ঝুঁকে পড়ে। যেগুলো তাদের নৈতিক অবক্ষয় ঘটায়। যেখান থেকে তাদের হুট করেই ফিরে আসা সম্ভব হয় না। অবশ্য মনোরম ও নির্দোষ চিত্ত বিনোদনের ব্যবস্থা আমাদের সমাজে খুবই কম, অর্থাৎ- যেখানে সুষ্ঠু চিত্ত বিনোদন করা যাবে। সেটিও একটি কারণ, যা তাদের পর্যায়ক্রমে অবক্ষয়ের দিকে নিয়ে যায়। এক্ষেত্রে পরিবারের সচেতনতাবোধও প্রয়োজন। যখন তারা তারুণ্যে প্রবেশ করে এক ধরনের স্বাধীনতা চায়, এ স্বাধীনতা পেলে তরুণরা তার অপব্যবহার করে। যে কারণে তারা অনেক সময় অনৈতিক কাজে ঝুঁকে পড়ে। কারণ সবচেয়ে বড় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান হলো পরিবার, যেখান থেকে তার নৈতিক মূল্যবোধের কাঠামোটি তৈরি হয়। যেটা আমরা ছোটবেলায় দেখি, মূল শিক্ষা সেখান থেকেই আসে। এক্ষেত্রে অনেক বড় ঘাটতি রয়েছে, মা-বাবা অনেক বেশি ব্যস্ত থাকার কারণে সন্তানের সঙ্গে সঠিক যোগাযোগ করতে পারে না। সন্তানকে যে ধরনের পরিবেশ দেয়া দরকার, সেটিও সম্ভব হয় না। যে কারণে এ ধরনের সমস্যাগুলো দেখা দেয়। এছাড়া ধর্মীয়, নৈতিক জ্ঞানে সমৃদ্ধ না করার বিষয়টিও সামনে চলে আসে। এখানে ঘাটতি থেকে যায়।

ফিলিপাইনের বিখ্যাত বুদ্ধিজীবী ও লেখক জোস রিজালের ভাষায়, 'তারুণ্যই হলো আমাদের ভবিষ্যতের একমাত্র আশা।' কথাটি চরম সত্য। কারণ, প্রতিটি দেশের জন্য তারুণ্য বা তরুণ প্রজন্ম বড় সম্পদ। তারাই পরবর্তী সময়ে দেশ পরিচালনা করবে, দেশের জন্য কাজ করবে। তেমনিভাবে আমাদের দেশের আজকের তরুণ প্রজন্ম আগামীর বাংলাদেশ গড়ার কারিগর। ❑

* *লেখক, কলামিস্ট, শিক্ষক।*

জেরুজালেমের ইতিহাস যেন পৃথিবীরই ইতিহাস

–মো. কায়ছার আলী*

মহাবিশ্বের অতিক্ষুদ্র পৃথিবী গ্রহের রহস্যময় অস্তিত্ব বহন করে মানবজাতি। আদি পিতামাতা আদম (আলাইহিস সালাম) ও হাওয়া (আলাইহাস সালাম) ছোট ছেলে কাবিল বড় ছেলে হাবিলকে হত্যা করার পরে শীষ (আলাইহিস সালাম) জন্ম হয়। আদি মানবের দশম বংশধর নূহ্ (আলাইহিস সালাম)-এর চার পুত্র যথাক্রমে সাম-এর বংশধর সেমেটিক আরব ইয়াহূদী, হাম এর হেমেটিক মিশরীয় ও ইরাকী, ইয়াফিস-এর ইন্দো-ইউরোপীয় এবং ইয়াম নাস্তিক হওয়ায় তার মৃত্যু হয় মহাপ্লাবনে। হামের পুত্র কেনান চার হাজার খ্রিষ্টপূর্বে ফিলিস্তিনে প্রথম বসতি স্থাপন করে। কেনান ফিলিস্তিনের প্রাচীন নাম সাম-এর বংশধর ইব্‌রা-হীম (আলাইহিস সালাম)-এর যুগে মুশরিক, প্যাগান বা প্রকৃতি পূজারিরা বাস করত। খ্রিষ্টপূর্ব একুশ শতকে তৎকালীন মেসোপোটেমিয়ার উর নগরে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। মরুভূমির যাযাবর কর্তৃক শহরটি ধ্বংসপ্রাপ্ত হলে স্বপরিবারে তিনি সেখান থেকে হেরান শহরে চলে আসেন বড় স্ত্রী সারাহ ছিলেন সম্ভ্রান্ত পরিবারের কেনানে জন্ম নেওয়া ইসাহাক (আলাইহিস সালাম) অর্থাৎ- মা ও ছেলেকে তিনি জেরুজালেমে এ রেখে আসেন। ২য় স্ত্রী সাধারণ পরিবারের হাজেরা এবং তাঁর ছেলে ইসমা'ঈল (আলাইহিস সালাম)-কে মক্কার মরুপ্রান্তে মহান আল্লাহর নির্দেশে রেখে আসেন। মজার বিষয় হলো– বয়সে ইসমা'ঈল (আলাইহিস সালাম) বড় এবং ইসাহাক (আলাইহিস সালাম) ছোট। একত্ববাদী তিনটি (ইয়াহূদী, খ্রিষ্টান ও মুসলিম) প্রতিষ্ঠিত ধর্মের জাতির পিতা ইব্‌রা-হীম (আলাইহিস সালাম)। বিগত দুই হাজার বছর ধরে তিনটি ধর্মের মধ্যে মহাপবিত্র স্থান জেরুজালেমকে কেন্দ্র করেই রক্তপাত অব্যাহত রয়েছে। জেরুজালেমের ইতিহাস যেন তামাম দুনিয়ার ইতিহাস। ইসহাক (আলাইহিস সালাম) দম্পতির জমজ দুই পুত্র বড় পুত্র ঈস আর ছোট পুত্র ইয়াকুব (আলাইহিস সালাম)। বাবা বড় ছেলেকে আর মা ছোট ছেলেকে একটু বেশি ভালোবাসতেন। মায়ের কৌশলে ইয়াকুব (আলাইহিস সালাম) বাবার কাছে বাড়তি দু'আ নিলে ঈস-এর রোষানলে পড়েন। তখন মায়ের পরামর্শে বাবার সম্মতিতে ইয়াকুব (আলাইহিস সালাম) হারানে তাঁর মামার বাড়ি চলে যান। যাবার সময় মা তাঁকে বলে দেন তাঁর মামাতো বোনকে বিয়ে করতে। ফিলিস্তিন অতিক্রম করার সময় সন্ধ্যা হলে তিনি একটি পাথরের উপরে মাথা দিয়ে ঘুমাচ্ছিলেন, তখন স্বপ্নে দেখেন সেখান থেকে ফেরেশ্‌তারা সিঁড়ি বেয়ে বেয়ে আকাশে উঠানামা করছে। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে ডেকে বললেন, ইয়াকুব (আলাইহিস সালাম)! আমি তোমাকে নবী বানালাম। সকালে তিনি সেই জায়গাটি চিহ্নিত করার জন্য পাথরের উপর তেল ঢেলে দিয়ে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলেন আল্লাহ তা'আলা তাঁকে সেখানে ফিরে আসার সুযোগ দিলে সেখানেই তিনি একটা মসজিদ বানাবেন। আর সেই মসজিদই হলো মসজিদুল আকসা। যার ভিত্তি প্রস্তর তিনিই করেন। মামার কাছে গিয়ে ছোট মেয়ে পরমা সুন্দরী রাহেলকে বিয়ে করার সম্মতি দেন। মামা সেই সময়ের প্রথা না ভেংগে বড় মেয়ে লাইয়াকে তাঁর সাথে বিয়ে দেন। পরবর্তীতে আবার ছোট মেয়েকেও তাঁর সাথে বিয়ে দেন। ওই সময়ে শরিয়তে একসাথে আপন দুই বোনকে বিয়ের অনুমতি ছিল। আপন দুইবোন এবং দুই দাসী (পরবর্তীতে স্ত্রী) মোট চারজনের গর্ভে ১২ জন পুত্র ও কয়েকজন কণ্যা সন্তান জন্ম নেয়। ছোট স্ত্রীর দুই ছেলে ইউসুফ (আলাইহিস সালাম) ও বেনিয়ামিন। বেনিয়ামিন জন্মের সময় তাঁদের মা মারা যান এবং তাঁরা মাতৃহারা হন। নবী ইয়াকুব (আলাইহিস সালাম) স্বপরিবারে হারান থেকে কেনানে ফিরে এসে তাঁর ভাই ঈস-এর সাথে মিলেমিশে বসবাস করেন। ইয়াকুব (আলাইহিস সালাম) যুক্তিসঙ্গত কারণে ইউসুফ (আলাইহিস সালাম)-কে একটু বেশি ভালোবাসতেন। ইয়াকুব (আলাইহিস সালাম)-এর অন্য আরেকটি নাম ছিল ইসরা-ঈল। তাঁর পরিবারের বার সন্তানকেই বলা হয় বানী ইসরা-ঈল। বাড়তি ভালোবাসা অন্য ভাইয়েরা পছন্দ করতেন না। তাই তারা বড় ভাই ইয়াহূদার (ইয়াহূদী বংশের প্রতিষ্ঠাতা) নেতৃত্বে পিতার নিষেধ সত্ত্বেও ইউসুফ (আলাইহিস সালাম)-কে বেড়াতে যাওয়ার কথা বলে হত্যার উদ্দেশ্যে কুয়ায় ফেলে দেয়। হিংসা ও বিদ্বেষ সেদিন থেকেই শুরু অর্থাৎ- সাদা দেওয়ালে প্রথম কালো দাগ। মহান আল্লাহর অপার মহিমায় তিনি সেদিন প্রাণে বেঁচে যান এবং মিশরীয় বণিকদের মাধ্যমে মিশরে ঠাঁই পান। নারীর ছলনায় জেলে গিয়ে মুক্তি পেয়ে প্রথমে সফল খাদ্য মন্ত্রী এবং পরে মিশরের শাসক হন। ছেলের অনুরোধে বাবা ইয়াকুব (আলাইহিস সালাম) এগার পুত্র ও কণ্যাসহ পরিবারের ৭০ জন সদস্য নিয়ে কেনান থেকে মিশরে চলে যান এবং বসবাস শুরু করেন। বংশ পরম্পরায় তারা প্রভাবশালী হয়ে প্রায় ৪৫০ বছর পর মহান আল্লাহর সাথে নাফরমানি করে এবং অভিশপ্ত হয়ে ফিরাউনের গোলামে পরিণত হয়। তাদের মাঝে মূসা (আলাইহিস সালাম)-এর আবির্ভাবে তারা উজ্জীবিত হয়। মূসা (আলাইহিস সালাম) নবুওয়াত প্রাপ্ত হন এবং তাঁর উপর প্রথম আসমানী কিতাব হিব্রু ভাষায় তাওরাত নাযিল হয়। মহান আল্লাহর অনুগ্রহে তাদের জীবনযাপন ভালোই চলছিল। মূসা (আলাইহিস সালাম) মৃত্যুর পর তারা তাওরাত থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। পরবর্তীতে আল্লাহপাক তাদের জন্য তালুত নামে এক রাজা নিযুক্ত করলেন। তালুতের নেতৃত্বে জেরুজালেমে দখল করার সময় বালক

* *লেখক, শিক্ষক, প্রাবন্ধিক ও কলামিস্ট।*

দাঊদ (আলাইহিস সালাম)-এর সাহসী ভূমিকার কারণে শত্রুপক্ষের সেনাপতি জালুতের চোখ নষ্ট হলে তারা যুদ্ধে জয়লাভ করে জেরুজালেম দখল করে। নবী দাঊদ (আলাইহিস সালাম)-এর উপর দ্বিতীয় আসমানী কিতাব হিব্রু ভাষায় যাবুর নাযিল হয় এবং তিনি রাজা হন। তাঁর ছেলে সুলাইমান (আলাইহিস সালাম) জেরুজালেমে থেকে সারা দুনিয়া শাসন করেন এবং মসজিদুল আল আকসা শক্তিশালী জিনদের দ্বারা পুনরায় নির্মাণ করেন। সুলাইমান (আলাইহিস সালাম)-এর মৃত্যুর পর ইয়াহূদীরা মহান আল্লাহর সাথে বিদ্রোহ করার ফলে জেরুজালেম থেকে বিতাড়িত হয়। মেসোপোটেমিয়ার দুর্ধর্ষ রাজা নেবুচাঁদ নেজার (৫৮৬ খ্রিষ্টপূর্ব)-এর আক্রমণে জেরুজালেমে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। তারা ইয়াহূদীদের দাস বানিয়ে বেবিলনে নিয়ে যায় এবং সাথে নিয়ে যায় তাবুতে সাকিনা মানে একটি সিন্দুক যেখানে মূসা (আলাইহিস সালাম) ও সুলাইমান (আলাইহিস সালাম) মুক্তিজার লাঠি ও আংটিসহ অনেক নবীর নিদর্শন সংরক্ষিত ছিল। সেই সিন্দুক তারা খুঁজে পাচ্ছে না। তাদের বিশ্বাস সেটা হাতে পেলে তারা বিশ্বজিৎ হবে। তখন থেকে প্রায় ২০০০ হাজার বছর তারা নির্বাসিত ও দাসত্ব বরণ করেছে। আল্লাহ তা'আলা প্রায় ৭০ হাজারের অধিক নবী সে সময় জেরুজালেমে প্রেরণ করেছেন। ইয়াহূদীরা হাজার হাজার নবীকে হত্যা এবং আসমানী কিতাবের আয়াতকে অস্বীকার করেছে। তারা বিশ্বাস করেন একজন মাসীহ আসবেন এবং তাদের উদ্ধার করবেন যখন 'ঈসা (আলাইহিস সালাম) মহান আল্লাহর অসীম কুদরতে তাদের মাঝে জন্ম লাভ করলেন তখন তারা তাঁর মা মারইয়াম (আলাইহিস সালাম)-কে ব্যাভিচারিণী বললেন। আর 'ঈসা (আলাইহিস সালাম)-কে বললেন জারজ সন্তান। 'ঈসা ইবনু মারইয়াম (আলাইহিস সালাম) জন্ম নেন বেথেলহামে থাকার ঠিকানা নাজারেথ এবং সর্বোপরি বর্ণময় জীবন কাটিয়েছেন ক্যালভারি পর্বতে। 'ঈসা (আলাইহিস সালাম)-এর জন্মস্থান খ্রিষ্টানদের উপাসনাঘর এবং সমাধিস্থান গীর্জাকে কেন্দ্র করে খ্রিষ্টান সমাজের কাছে জেরুজালেম পুণ্যভূমি। তাঁর নিকট আসমানী কিতাব ইঞ্জিল হিব্রু ভাষায় নাযিল হয়। ইয়াহূদীদের দেবতা সুলাইমান (আলাইহিস সালাম)-এর 'ইবাদত গৃহের ধ্বংসপ্রাপ্ত কান্নার দেওয়ালকে কেন্দ্র করে জেরুজালেম তাদের নিকট প্রতিশ্রুত ভূমি। আর মুসলমানদের নিকট প্রথম কিবলাহ ও মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মি'রাজের রাতে সকল নবী-রাসূল ও ফেরেশ্তাদের নিয়ে নিজে ইমামতি করে দুই রাকআত নামায আদায়ের কারণে তা পবিত্রভূমি। শতাধিক নবীদের সমাধি, প্রার্থনাগার, নবী-রাসূলদের পদচারণায় পূর্ণ, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বোরাকের দেওয়াল, গুণাহ মাফের স্থান, ডোম অব দ্য রব ও বায়তুল মুকাদ্দাস ইত্যাদি আরও অনেক কিছুই সেখানে বিদ্যমান। ইয়াহূদীরা নবী 'ঈসা (আলাইহিস সালাম)-কে শুধু শান্তিতেই থাকতে দেননি; বরং তাঁকে শূল বিদ্ধ করে হত্যা করেন। আল কুরআনের ভাষ্যমতে "তিনি সেদিন মারা যাননি" আল্লাহ তা'আলা তাকে আসমানে উঠিয়ে নেন। তথাকথিত তাঁর মৃত্যুতে যারা খুশি হন, তারা ইয়াহূদী আর যারা ব্যথিত হন তারা নাসারা (খ্রিষ্টার্ন)। ইসলামের ইতিহাস পাঠ করলে জানা যায় চার খলিফা উমাইয়াহ্, 'আব্বাসীয়, ফাতেমিয় খিলাফতে ফিলিস্তিন মুসলমানদের অধীনে ছিল। পরবর্তীতে ক্রুসেড (১০৯৯-১১৮৭ পর্যন্ত খ্রিষ্টানদের দখলে) অতপর মহাবীর সালাউদ্দিন আইয়ূবী জেরুজালেমে বিজয় পতাকা উড্ডীন করেন। মুসলিম সোনালী ইতিহাস প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর আস্তে আস্তে মলিন হতে শুরু করে। তুরস্কের পরাজয় ১৯১৭-১৯৪৭ সাল পর্যন্ত ফিলিস্তিন বৃটিশদের দখলে ছিল। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে পালিয়ে বেড়ানো এবং হিটলার কর্তৃক ৬০ লক্ষ ইয়াহূদী নিধনের পর হাজার হাজার ইয়াহূদী ফিলিস্তিনে এসে জমি ক্রয় করে বসবাস শুরু করে। জায়োনিস্ট ও ইয়াহূদীরা ব্রিটিশ পররাষ্ট্র মন্ত্রী কর্তৃক বেলফোর ঘোষণা অনুযায়ী সাম্রাজ্যবাদী শক্তির প্রকাশ্যে মদদে ১৯৪৮ সালে ইসরা-ঈল নামক একটা রাষ্ট্র জন্মলাভ করে। জাতিসংঘের ১৯৩টি দেশের মধ্যে ইজরা-ঈলকে ১৬৫টি দেশ এবং ফিলিস্তিনকে ১৩৮টি দেশ সমর্থন করে। তখন থেকেই ফিলিস্তিন দাউ দাউ করে জ্বলছে। উদার ফিলিস্তিনিদের সরলতার সুযোগে তারা আজ সবকিছু দখলে মরিয়া। ইজরাইলের আয়তন দিনে দিনে বাড়ছে আর ফিলিস্তিনের কমছে। ইসমা'ঈল (আলাইহিস সালাম)-এর বংশের একমাত্র মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)। তাঁর উপর শুধুমাত্র আরবি ভাষায় নাযিলকৃত "আল কুরআন" নির্ভুল হওয়ায় ইয়াহূদীরা তা মেনে নিতে পারেননি। ইব্রা-হীম (আলাইহিস সালাম) এবং ইসমা'ঈল (আলাইহিস সালাম) পিতা পুত্র মিলে কাবাঘর তৈরি করেন। বাল্যকাল থেকেই ইয়াহূদীরা প্রিয় নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে হত্যার চেষ্টা, খাদ্যে বিষ মেশানো এবং বাদশাহ নুরউদ্দীনের সময় নবীজির পবিত্র দেহ মোবারক চুরি করার শেষ প্রান্তে পৌঁছে গিয়েছিল। ইয়াহূদীরা মনে করে দাজ্জালকে মাসীহ আর মুসলিম ও খ্রিষ্টানরা মনে করে 'ঈসা (আলাইহিস সালাম) মাসীহ এসে পৃথিবী জয় করবেন। একই সময়ে ইমাম মাহাদিও এসে 'ঈসা (আলাইহিস সালাম)-এর সাথে যোগ দিয়ে ইয়াজুজ-মাজুজ-এর ফিতনা দূরীভূত করবেন। ধরণির বুকে ইয়াহূদী জাতির শুরু হয়েছিল মহিমান্বিত মানুষের হাত ধরেই। মরুশহর জেরুজালেম এর মধ্যেই লুকিয়ে আছে অনেক ইতিহাস ঐতিহ্য ও উত্থান পতনের প্রতিচ্ছবি। অহমিকা বা ইগোর কারণে তারা মুসলমানদেরকে শত্রু মনে করে। চলমান যুদ্ধে জয় পরাজয় থাকবে, হয়তো কিছুদিন যুদ্ধ বিরতি খানিকটা কার্যকর হবে মধ্যস্থতার সাথে কিছু চুক্তিও হতে পারে ফাতাহ বা হামাসের সাথে (প্রকাশ্যে বা গোপনে)। বাঘ ও হরিণ যেভাবে সুন্দরবনে বসবাস করে ঠিক সেভাবেই ইসরা-ঈল ও ফিলিস্তিনের সাধারণ মানুষেরা অসম যুদ্ধে লিপ্ত হতে থাকবে, আপন বেগে চলতে থাকবে দখল আর পাল্টা দখল। ❑

কিশোর ভুবন

গাধা যখন গল্প বলে!

মূল : আব্দুত তাওয়াব ইউসুফ

অনুবাদ : আহমাদ রফিক*

অনেক দিন আগের কথা। আমি তখন মরুভূমিতে থাকতাম। আমার মালিক ছিলেন একজন মহিলা। তার নাম হালিমা। হালিমাতুস সা'দিয়া (রাযিয়াল্লাহু আনহা)। তিনি ছিলেন দুধ-মা। তোমাদের চেয়েও যারা ছোট, সেই ছোট ছোট বাচ্চাদেরকে তিনি দুধ পান করাতেন। তখন তো আর এখনকার মতো কৌটায় করে দুধ কিনতে পাওয়া যেতো না। তাই আরব দেশের মানুষ কী করতো জানো? তারা তাদের সন্তানদেরকে দুধমায়ের কাছে পাঠিয়ে দিতো। দুধ-মা সেই সন্তানকে আদর-যত্ন করে বড় করতেন।

আমার মালিক হালিমা ছিলেন খুবই গরীব। তার স্বামীর নাম ছিল হারেস। তারা একটি তাঁবুতে থাকতো। তাদের তাঁবুটি ছিলো এমন এলাকায়, যেখানে বৃষ্টি হতো একেবারেই কম। সবুজ গাছপালা বলতে গেলে ছিলোই না। তাদের সাথে থাকতে থাকতে আমিও খুব রোগা হয়ে গিয়েছিলাম।

একদিনের গল্প বলি। আমার মালিক হালিমা আমাকে তার তাঁবুর সামনে নিয়ে আসলেন। আমি তো প্রথমে খুবই খুশি হলাম। ভাবলাম, আমাকে মনে হয় মাঠে নিয়ে যাওয়া হবে। আর আমিও অনেক দিন পর একটু সবুজ ঘাস খেতে পারবো। কিন্তু না, হালিমা তার ছোট বাবুটাকে কোলে নিয়ে আমার পিঠে উঠলেন। বাবুটা পঁচা ছেলেদের মতো সারাদিন শুধু কান্না করতো। আর হালিমার স্বামী একটা বুড়ো উটের পিঠে উঠলেন। আমরা মরুভূমির ভেতর দিয়ে চলতে লাগলাম।

চারপাশে কী প্রচণ্ড গরম! না খেতে পেয়ে আমি একদম ক্লান্ত হয়ে গিয়েছিলাম। হাটা তো দূরের কথা এক পা আগাতেও আমার খুব কষ্ট হচ্ছিল। আর ওই যে বাবুটা! ও কিন্তু কান্না করতেই থাকলো করতেই থাকলো। হালিমা ওর কান্না বন্ধ করার জন্য ওকে দুধ খাওয়াতে গিয়ে দেখলেন তার দুধ শুকিয়ে গিয়েছে। একফোঁটা দুধও তিনি বাবুকে খাওয়াতে পারলেন না। এই অবস্থা দেখে তার স্বামী বললেন– তুমি তো একটা বাবুকেই দুধ খাওয়াতে পারছো না, আরেকটা বাবু আনলে তাকে আবার কিভাবে খাওয়াবে? হালিমা বললেন– আরেকটা বাবু আনলে সেই বাবুর বাবা মা তো আমাকে টাকা দিবে। তখন আমি সেই টাকা দিয়ে খাবার কিনে খাবো। খাবার খেলেই আমার বুকে দুধ আসবে। সেই দুধ আমি দুই বাবুকেই খাওয়াতে পারবো। এজন্য আমাদের একটি বড়লোক পরিবার খুঁজে বের করতে হবে। যেন আমরা বেশি টাকা পাই।

আমার না খুব জানতে ইচ্ছা করছিল যে আমরা কোথায় যাচ্ছি। তাই আমার সাথের উটটাকে জিজ্ঞেস করলাম। সে আবার বুড়ো তো! তাই রাস্তাঘাট আমার চেয়ে বেশি চেনে। সে বললো যে আমরা মক্কায় যাচ্ছি।

তোমরা কি মক্কার নাম শুনে খুশি হও না? আমি কিন্তু খুবই খুশি হলাম। খুশিতে আমি খুব জোরে দৌড়াতে লাগলাম। হঠাৎ এতো জোরে দৌড়ানোর শক্তি যে আমার মধ্যে কোত্থেকে এলো! অন্য সবার আগে আমরা মক্কায় পৌঁছে গেলাম। এতো তাড়াতাড়ি পৌঁছার কারণে হালিমাও খুব খুশি হলো। তিনি দুধ খাওয়ানোর জন্য একটা বাবু খুঁজতে চলে গেলেন।

অনেকক্ষণ পর যখন তিনি ফিরে এলেন, দেখলাম তিনি কোনো বাবু খুঁজে পাননি। মন খারাপ করে তিনি তার স্বামীকে বললেন– আমাদের কপালই খারাপ। ক্ষুধা পেটে নিয়েই মনে হয় আমাদেরকে মক্কা থেকে চলে যেতে হবে।

তার কথা শুনে আমার না খুব কষ্ট লাগলো। আহারে! হালিমা ছিলেন আমার মতোই দুর্বল। তাই কেউ তাকে তাদের বাবু দেয়নি। কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়েই তিনি আবার বাবু খুঁজতে চলে গেলেন। যদি কেউ দয়া করে এই আশায়। হঠাৎ দেখি তিনি আমাদের দিকে দৌড়ে আসছেন। তাকে দেখে খুব খুশি খুশি লাগছে। তিনি তার স্বামীকে ডেকে বললেন– আলহামদুলিল্লাহ! আমি দুধ খাওয়ানোর জন্য একটা বাবু খুঁজে পেয়েছি।

তার কথা শুনে আমরাও খুব খুশি হলাম। হালিমা বাবুটাকে কোলে নিয়ে আমার কাছে আসতেই আমি এত চমৎকার মিষ্টি একটা ঘ্রাণ পেলাম! আহ! ঘ্রাণটা আসছিল বাবুর শরীর থেকে। বাবুটা ছিলো চাঁদের মতো সুন্দর। আর কী মিষ্টি দেখতে!

হালিমার স্বামীও বাবুটাকে দেখে খুব খুশি হলো। হালিমাকে বাবুটার নাম-পরিচয় জিজ্ঞেস করলো। হালিমা বললো– ওর নাম মুহাম্মাদ। মুহাম্মাদ বিন 'আব্দুল্লাহ বিন 'আব্দুল মুত্তালিব। ওর দাদা আব্দুল মুত্তালিব কুরাইশদের সর্দার।

* *অধ্যয়নরত, মাদরাসা দারুস সুন্নাহ, মিরপুর, ঢাকা।*

ওর বাবা 'আব্দুল্লাহ মারা গেছেন কিছুদিন আগে। ওর মায়ের নাম আমিনা বিনতু ওহাব। আরবের অভিজাত বংশগুলোর মধ্যে মুহাম্মাদের বংশ অন্যতম।

এমন একটা বাবুকে দুধ খাওয়ানো আর লালন-পালন করার সুযোগ পেয়ে হারেস আর হালিমা খুব খুশি হলো। এরপর হালিমা কোলে নিয়ে আমার পিঠে বসলেন। আর তখনই কী হলো জানো? কোত্থেকে যেন আমার মধ্যে অনেক শক্তি চলে আসলো। সব ক্লান্তি, ক্ষুধা, পিপাসা দূর হয়ে গেলো। আমি শুরু করলাম দৌড়। বুড়ো উটটাও আমার সাথে পাল্লা দিয়ে দৌড়াতে লাগলো। সবাইকে পিছনে ফেলে অনেক তাড়াতাড়ি আমরা হালিমাদের তাঁবুতে এসে পৌঁছলাম।

আমরা এসে তাঁবুতে পৌঁছতেই সব কেমন যেন বদলে গেলো। আগে যেখানে একফোঁটা বৃষ্টিও হতো না, সেখানে এখন ঘন ঘন মেঘ জমে বৃষ্টি হতে লাগলো। সবুজ ঘাস, গাছপালা দিয়ে মাটি ভরে গেলো। এত এত ঘাস হলো যে, আমি, বুড়ো উট আর অনেকগুলো ছাগল মিলেও সেগুলো খেয়ে শেষ করতে পারলাম না। মুহাম্মাদ নামের বাবুটা এখানে আসার সাথে সাথেই আকাশ, বাতাস, মানুষ, পাখি সবকিছু বদলে গেলো। আগের চেয়ে সুন্দর হয়ে গেলো। ভালো হয়ে গেলো।

আর হালিমাকে দেখো তোমরা! কিছুদিন আগেও যিনি একটা বাবুকেই দুধ খাওয়াতে পারতেন না, সেখানে এখন দু'জনকে দুধ খাওয়ানোর পরও অনেক দুধ থেকে যায়। মুহাম্মাদ আসার পর হালিমা আর হারেস অনেক সুখী হলো। মাঝে মাঝে হালিমা মুহাম্মাদকে সাথে নিয়ে আমার পিঠে উঠতেন। তখন যে আমার কী খুশি লাগতো! মজার ব্যাপার কী জানো? আমি যখন মুহাম্মাদ আর হালিমাকে পিঠে নিয়ে মরুভূমিতে হাটতাম, আমার না একটুও কষ্ট হতো না। একটুও রোদ লাগতো না। মনে হতো আকাশের মেঘ আমাদেরকে ছায়া দিচ্ছে।

দেখতে দেখতে মুহাম্মাদের বয়স দুই বছর হয়ে গেলো। দুই বছর হয়ে গেলে কি কেউ আর বুকের দুধ খায়? খায় না। মুহাম্মাদও আর হালিমার বুকের দুধ খাবে না। মুহাম্মাদকে এখন মক্কায় ওর মায়ের কাছে ফিরিয়ে দিয়ে আসতে হবে। তাই একদিন হালিমা মুহাম্মাদকে নিয়ে আমার পিঠে উঠলেন। আমি তাদেরকে নিয়ে মক্কায় চললাম। পুরোটা পথ হালিমা চুপচাপ কী যেন চিন্তা করছিলেন।

একসময় আমরা মক্কায় মুহাম্মাদের বাড়িতে পৌঁছলাম। হালিমা মুহাম্মাদকে নিয়ে তার মায়ের কাছে গেলেন। একটু পর ঘরের ভেতর থেকে আমি কথাবার্তার আওয়াজ শুনতে পেলাম। শুনলাম হালিমা মুহাম্মাদের মা আমিনাকে বলছেন যেন মুহাম্মাদকে তার সাথে আরো কিছুদিন থাকতে দেয়া হয়। আমিনা তো মানাই করে দিয়েছিলেন। কিন্তু হালিমা যখন বারবার করে বলতে লাগলেন তখন আমিনার মন নরম হলো। তিনি মুহাম্মাদকে আরো কিছুদিন হালিমার সাথে থাকার অনুমতি দিলেন।

মুহাম্মাদকে নিয়ে খুশিমনে যেন উড়তে উড়তে আমরা হারেসের কাছে পৌঁছলাম। সব শুনে হারেসও খুব খুশি হলো। মুহাম্মাদ দ্বিতীয়বারের মতো আমাদের কাছে ফিরে এলো। সুখে শান্তিতে আমাদের দিন কাটতে লাগলো। তারপর একদিন হঠাৎ করে এমন একটা ঘটনা ঘটলো যে আমরা সবাই ভয় পেয়ে গেলাম।

হালিমার ছোট ছেলেটা দৌড়ে এসে চিৎকার করে বললো– মুহাম্মাদকে ধরে নিয়ে গেছে! সাদা জামা পরা ধবধবে সাদা চুলদাড়িওয়ালা দু'জন লোক এসে মুহাম্মাদকে ধরে নিয়ে গেছে। হারেস ভয় পেয়ে বললেন– মুহাম্মাদকে ধরে নিয়ে গেছে? হায় হায়! সে তো আমাদের কাছে আমানত। তার নিরাপত্তার দায়িত্ব তো আমাদের। ছেলেটা বলতে লাগলো– তারা মুহাম্মাদকে ধরে নিয়ে গিয়ে একজন মুহাম্মাদের বুক চিরে ফেলেছে। আরেকজন মুহাম্মাদের বুকের ভেতর থেকে কী যেন খুঁজে নিয়ে চলে গেছে।

এই কথা শুনেই হালিমা আর হারেস মুহাম্মাদকে খুঁজতে বেরিয়ে গেলেন। তাদের পিছু পিছু আমিও দৌড়ে গেলাম কী হয়েছে দেখার জন্য। দেখি– মুহাম্মাদ চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে। তার চাঁদপানা মুখে লেগে আছে একটুকরো মিষ্টি হাসি।

মুহাম্মাদ যদিও বললো যে সে নিরাপদে আছে, তার কিছুই হয়নি, কিন্তু তারপরও হালিমা আর হারেস খুব চিন্তিত হয়ে পড়লেন। তারা ঠিক করলেন– মুহাম্মাদকে মক্কায় তার মায়ের কাছে ফিরিয়ে দিয়ে আসবেন।

মুহাম্মাদ আমাদের ছেড়ে চলে গেলো। কিন্তু আমাদের সৌভাগ্যবান বানিয়ে দিয়ে গেলো। আগের মতোই ভরপুর বৃষ্টি হতে লাগলো, সবুজ গাছগাছালি উৎপন্ন হতে লাগলো। আমাদের আর কোনো দুঃখ থাকলো না। আমরা সুখে শান্তিতে বসবাস করতে লাগলাম।

ও হ্যাঁ! তোমাদেরকে তো সেদিনের আসল ঘটনা বলাই হয়নি। ওই সাদা জামা পরা লোক দু'জন ছিলেন ফেরেশ্‌তা। তারা সেদিন মুহাম্মাদের হৃদয়টা ধুয়ে পরিস্কার পবিত্র করে দিয়েছিলেন। কারণ সামনে যে মুহাম্মাদের অনেক দায়িত্ব! ছোট্ট মুহাম্মাদকে তো বড় হয়ে নবী হতে হবে। তোমরা বলো– "সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম"। ❑

কবিতা

আর বাজে না সুর

মোল্লা মাজেদ*

তোমার আমার ব্যথার মাঝে আর বাজে না সুর
মাঝখানে অতল জলধি সপ্ত সমুদ্দুর
ফুল সোহাগী ফুলদলে আর ঝরে না চোখের জলে
কান্না-হাসির মিলন মেলা নয় তো বহুদূর
তোমার আমার ব্যথার মাঝে আর বাজে না সুর।

তোমার আমার সমাহারে গায় না পাখি গান
ফুল ফাগুনে আর ভাসে না কোয়েলীয়ার তান।
ছিন্ন তারে হৃদয় বীণা মিলন সুরে আর বাজে না
উথাল পাথাল ঢেউয়ের নদী গায় না সুমধুর
তোমার আমার ব্যথার মাঝে আর বাজে না সুর।

কাঁদো ফিলিস্তিন কাঁদো

মো. আব্দুল হাই

কাঁদো ফিলিস্তিন! কাঁদো!!
তোমার বুকের পবিত্র ভূমি ক্ষতবিক্ষত করে
অভিশপ্ত রক্তপিপাসুরা।
শুধু মিথ্যে বেসাতির মেকি প্রলোভনে ছড়ানো গল্পে;
উদ্বাস্তুরা আজ শৃঙ্খলিত করেছে আমায়।
বিশ্ববিবেক কোথায়? তারা নিশ্চুপ নিরবতায়।
পাশবিক হিংস্রতায় লক্ষ শিশু মুমূর্ষুতায়,
কাতরাচ্ছে কাতরাচ্ছে! বোমা-বৃষ্টির নির্লিপ্ত জিঘাংসায়।
না! মায়ের বুকের উষ্ণতায় নয়,
হাসপাতালের জীর্ণ বিছানায় শুয়ে।
রোনাজারিতে মিশে গেছে ফিলিস্তিনের আকাশ।

তবুও তুমি কাঁদো ফিলিস্তিন! কাঁদো।
স্বাধীনতাকামী লক্ষ যুবকের ঈমানদীপ্ত শপথে
কোথায় আজ বিশ্ব মুসলিম?
শুধু আবেগের বলিহারি! নেই যেনো অশ্রুর প্লাবন,
দু'আয় নিমগ্ন কোনো আপনার জন।
আজ ঐক্যের অভাবে দিশেহারা যখন প্রিয় জনপদ,
পবিত্র ভূমি। আমার কেবলা,
আমার সিজদাহ্'র স্থানকে করেছে পদদলিত।
সাজদায় উপনীত শহীদের মস্তক তুলবার
আর নেই কোনো প্রয়োজন।
চিরকাঙ্ক্ষিত পথে মিলছে যবে প্রভুর মহামিলন।
মহুর্মুহু আঘাতে মানবতাকে করছে লুণ্ঠিত।
তখন তোমার কি-ই বা করার?

তাই কাঁদো ফিলিস্তিন কাঁদো।
আমার নির্লিপ্ততায় বেলফোর নামক সাজানো
প্রহেলিকায়, আশ্রিতরা আজ শাসকের ভূমিকায়।
এই দায়ভার তো আমাতে'ই বর্তায়।
আমার সম্মান, ইজ্জত লুণ্ঠন করে ওরা
মেতেছে নগ্ন উল্লাসে।
আল কুদস, গাজা, বিসান, আগওয়ারে
বোনদের আত্মচিৎকার আমার কানে পৌঁছে না।
বেথেলহামের পবিত্রতা কোথায় আজ?
বেঁচে থাকার স্বার্থকতা খুঁজে ফিরি যখন সংকীর্ণ
মানসিকতায়।
আমি ভুলে গেছি হৃদয়ের আকুলতা
লৌহ কঠিন শপথ, আর মহান আল্লাহর তরবারির সেই
আবেদন।
যায় যাবে মমপ্রাণ তবু রক্ষা করিব মজলুম জন।
নিপীড়িত মানবতা করে হাহাকার
আমার মানসিক বিবর্তনে;
তাই কাঁদো ফিলিস্তিন! কাঁদো!! [সমাপ্ত]

মহামারী ভাইরাস

শেখ শান্ত বিন আব্দুর রাজ্জাক*

থমথমে পুরো দেশ গমগমে শহর
জোর যার সব তার দেখি সেই খবর;
কোটি টাকা করে চুরি খুন শতশত
হেসে হেসে করে চলে অন্যায় যত।
রক্তে স্নান করে ফেলে মিঠা জল
বুক চিরে ছুটে চলে যেন বীরবল;
হাতে পেলে ক্ষমতা লুটেপুটে খায়
পেট তবু ভরে না হা করে চায়।
মিথ্যা বচনে মাইক দেয় ফাটিয়ে
বসে থেকে টাকা পায় কেউ মরে খাটিয়ে;
পথেপথে ঘুরাঘুরি হাতে হাতে অস্ত্র
আইনের কালো চোখে এরা সাদা বস্ত্র।
মিথ্যার বেড়াজালে সত্যকে ঢাকে
চোরের বড় গলা বাঘ যেন ডাকে;
রাজনীতির পোশাকে খেয়ে যায় গোস-মাছ
দেশের তরে এরা আজ মহামারী ভাইরাস।

---

* রঘুনাথপুর, পাংশা, রাজবাড়ি-৭৭২০।

* বামনাছড়া গয়নারঘাট, উলিপুর, কুড়িগ্রাম।

স্বাস্থ্য-সচেতনতা

ফুসফুস : মানবদেহের বেলুন

–মো. হারুনুর রশিদ*

ফুসফুস : ফুসফুস মানবদেহের একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। ব্রঙ্কাস, ব্রঙ্কিওল অসংখ্য অ্যালভিওলাস ও রক্তনালী নিয়ে ফুসফুস গঠিত। মানবদেহে দু'টি ফুসফুস আছে– ডান ফুসফুস এবং বাম ফুসফুস। প্রতিটি ফুসফুস প্লুরা নামক দুই প্রস্থ পর্দা দ্বারা আবৃত থাকে। পর্দাদ্বয়ের ভেতরে এক প্রকার পিচ্ছিল রস থাকায় শ্বাস-প্রশ্বাসের সময় কোনো রকম ঘর্ষণ হয় না।

মানুষের দু'টি ফুসফুসের একত্রে ওজন হলো ১.৩ কিলোগ্রাম (২.৯ পাউন্ড)। ডান ফুসফুস থেকে বাম ফুসফুস কিছুটা ছোট হয়। বাম ফুসফুসের ২টি লোব (ফুসফুসের ওপরিভাগ বা লতি) আছে এবং এগুলো ডান ফুসফুসের চেয়ে সামান্য ছোট।

অপরদিকে ডান ফুসফুসের ৩টি লোব আছে। বাম ফুসফুসের গঠন ডান ফুসফুসের কাঠামো থেকে কিছুটা আলাদা (লোবের সংখ্যার পার্থক্য ব্যতীত)। বাম ফুসফুসে একটি কার্ডিয়াক খাঁজ রয়েছে। কার্ডিয়াক খাঁজ হলো হৃৎপিণ্ডের সংকুলানের ছোট একটি স্থান। মানব ফুসফুসগুলো পাঁজরের খাঁচা দ্বারা রক্ষিত। ফুসফুসের শেষে ঝিল্লি অবস্থিত। এটি ফুসফুসকে বাতাস গ্রহণ করতে ও ত্যাগ করতে সাহায্য করে। শ্বাসনালীর মাধ্যমে ফুসফুসে বাতাস প্রবেশ করে। ডান পাশের ফুসফুস বাম পাশের ফুসফুসের চেয়ে বেশি বাতাস গ্রহণ করে। সাধারণত একজন পূর্ণবয়স্ক মানুষের ফুসফুসে প্রায় ৫ লিটার বাতাস ধরে।

ফুসফুস মানুষের শরীরে রক্তের মাধ্যমে সকল কোষে অক্সিজেন সরবরাহ করে এবং মানুষ কার্বন ডাইঅক্সাইড ত্যাগ করে। ফুসফুসে প্রায় ৩০০ কোটি অতি ক্ষুদ্র ধমনী আছে। ফুসফুসগুলো রক্ষা করা হয় ঝিল্লির আবরণ দ্বারা, যাকে ফুসফুসগত ঝিল্লি বলে।

ফুসফুসের কাজ : শরীরের একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ ফুসফুসের সাহায্যে আমরা অক্সিজেন গ্রহণ ও ক্ষতিকর কার্বন ডাই-অক্সাইড বের করে দিই। হৃৎপিণ্ড ভালো রাখতে ফুসফুসের সুষ্ঠুভাবে কাজ করা খুবই জরুরি। শ্বাস প্রশ্বাসের সময় নানা প্রকার ক্ষতিকর গ্যাস আমাদের শরীরে প্রবেশ করতে পারে যা দেহের জন্য হুমকিস্বরূপ। তাই এই দূষিত পরিবেশ যত তাড়াতাড়ি পরিহার করা যায়, ততই ভালো। আর এই গুরুত্বপূর্ণ কাজে সহায়তা করে এই ফুসফুস যার সাহায্যে আমরা শরীরে প্রয়োজনীয় অক্সিজেন গ্রহণ ও শরীর থেকে ক্ষতিকর কার্বন ডাই-অক্সাইড বের করে দিই। অঙ্গটিতে ডালপালার মতো অসংখ্য ছোট নালি রয়েছে যার মাধ্যমে নাকের ভেতর দিয়ে ফুসফুসে প্রবেশ করা বাতাস হৃৎপিণ্ড পর্যন্ত পৌঁছে যায়। আমাদের শরীরে হৃৎপিণ্ড ও ফুসফুসের অবস্থান পাশাপাশি। তাই হৃৎপিণ্ডকে ভালো রাখার জন্য ফুসফুসেরও সুষ্ঠুভাবে কাজ করা অনেক জরুরি। এজন্য ফুসফুস সুস্থ রাখতে অনেক যত্নবান হতে হবে।

এ জন্য খাদ্যতালিকায় অ্যান্টি অক্সিডেন্ট এবং ভিটামিন সি সমৃদ্ধ খাবার রাখা উচিত। ধূমপান, ধুলা, ধোঁয়া ফুসফুসের জন্য খুবই ক্ষতিকর। ধূমপানের কারণে ফুসফুসে ক্যান্সার পর্যন্ত হতে পারে। ধূমপান থেকে বিরত থাকা, বায়ুদূষণ এড়িয়ে চলা ফুসফুসকে সুরক্ষিত রাখতে সাহায্য করে। এ ছাড়া নিয়মিত শ্বাস-প্রশ্বাসের ব্যায়াম ফুসফুসকে সুস্থ রাখে।

ফুসফুস সুস্থ রাখার উপায় এবং ফুসফুস রোগের মূল কারণ : আমাদের বেঁচে থাকার জন্য প্রতিটা মুহূর্তে শ্বাস-প্রশ্বাস নেওয়া প্রয়োজন। এক মুহূর্ত আমরা নিঃশ্বাস ছাড়া বেঁচে থাকতে পারি না। আর আমাদের বেঁচে থাকার জন্য এবং নিঃশ্বাস নেওয়ার জন্য প্রধানত ফুসফুস কাজ করে থাকে। এজন্য ফুসফুস আমাদের দেহের একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

আমাদের বেঁচে থাকার জন্য এবং শ্বাস নেয়ার জন্য অবশ্যই ফুসফুস সুস্থ থাকা প্রয়োজন। কিন্তু বর্তমানে বেশিরভাগ লোকই ফুসফুস এর বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত। এছাড়াও প্রতিনিয়ত শ্বাসকষ্টে ভুগছে অগণিত মানুষ। তবে ফুসফুস রোগের সমস্যা আমাদের বাংলাদেশে অনেক বেশি।

ফুসফুস সুস্থ রাখার উপায় এবং ফুসফুস রোগের মূল কারণ। তবে এর মূল কারণ হচ্ছে বাংলাদেশের আবহাওয়া এবং পরিবেশ পরিস্থিতি। আমাদের দেশের অগণিত মানুষ শ্বাসকষ্ট জনিত সমস্যায় ভুগছে।

কিন্তু সমস্যাটা বড় কথা নয়, সমস্যাটা সমাধান করে স্বাভাবিকভাবে বাঁচতে পারাটাই আসল কথা। এজন্য অবশ্যই আমাদের সচেতন থাকতে হবে এবং ফুসফুস ভালো রাখার জন্য সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। কারণটা আগেই বলেছি ফুসফুস আমাদের শরীরের অন্যতম একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

ফুসফুস রোগে আক্রান্ত হওয়ার কারণ : ফুসফুসের বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হওয়ার মূল কারণ অসাবধানতা। হ্যাঁ

* *ফারাক্কাবাদ, বিরল, দিনাজপুর।*

একদমই ঠিক ফুসফুস ভালো রাখার জন্য আমাদের অবশ্যই সর্তকতা অবলম্বন করার পাশাপাশি স্বাস্থ্যবিধিগুলো মেনে চলতে হবে। অন্যথায় আমাদের বিভিন্ন রকম ফুসফুসের রোগে আক্রান্ত হয়ে জটিল সমস্যার সম্মুখীন হতে হবে।

তাছাড়াও আমাদের বাংলাদেশে আগেকার সময় যক্ষ্মা রোগের সংক্রমণ বেশি ছিল। তবে এর মূল কারণ ছিল বাংলাদেশের পরিবেশ পরিস্থিতি এবং সঠিক চিকিৎসার অভাবে। আর তার থেকেও বড় কারণ হলো বাংলাদেশের মানুষের ভিতরে গণ সচেতনতা ছিল না।

তবে খুশির কথা হচ্ছে বর্তমানে এই সমস্যাটা এখন নেই বললেই চলে। কারণ বর্তমানে মানুষ অনেক সচেতন হয়ে গেছে এবং যক্ষা রোগের সংক্রমণ একদমই কমে গেছে।

ফুসফুস-এর শত্রু : আমরা অবশ্যই জানি ধূমপান আমাদের ফুসফুসের জন্য এবং স্বাস্থ্যের পক্ষে কতটা ক্ষতিকর। দীর্ঘদিন ধূমপান করার ফলে ফুসফুসে ক্যান্সার হয়ে যায়। এছাড়াও হাঁপানি এবং শ্বাসকষ্টসহ নানা রকম মারাত্মক কঠিন রোগে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি অনেকটাই বেড়ে যায়।

তাছাড়াও ধূমপান আমাদের ফুসফুসসহ স্বাস্থ্যের পক্ষে কতটা ক্ষতিকর তা সংক্ষিপ্তভাবে ব্যাখ্যা করে বলা সম্ভব নয়। কিন্তু তবুও তরুণ প্রজন্ম প্রতিনিয়ত ধূমপানের দিকে ঝুঁকে পড়ছে। যদিও তরুণ সমাজ ধূমপানের ক্ষতিকর দিকগুলো ভালো করেই জানে। তাছাড়া বর্তমানে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ধূমপানের ক্ষতিকর দিকগুলো ভালোভাবে উপস্থাপন করা হয়। তবে সবচেয়ে অবাক করা বিষয় হচ্ছে বর্তমানে মেয়েরাও ধূমপানে আসক্ত হচ্ছে।

শুধু ধূমপান নয় বিভিন্ন প্রকার ক্ষতিকারক নেশাদ্রব্য সেবন করতে শুরু করেছে এবং মারাত্মকভাবে আসক্ত হয়ে পড়তে শুরু করেছে। কিন্তু সবচেয়ে দুঃখের বিষয় হচ্ছে এরা নেশাদ্রব্যের ক্ষতিকারক দিকগুলো খুব ভালো করে জানা সত্ত্বেও তারা প্রতিনিয়ত নিজেদের ক্ষতি করে চলেছে।

এছাড়াও রয়েছে বায়ুদূষণ, বাংলাদেশের অনেক বড় একটি সমস্যা হচ্ছে বায়ুদূষণ। আমাদের দেশের বায়ু কতটা দূষিত তা শহরে গেলেই স্পষ্টভাবে ধারণা পাওয়া যায়। বর্তমানে গ্রাম শহর সব জায়গার বায়ুদূষিত অবস্থায় আছে।

বিশেষ করে ইটের ভাটা এবং বিভিন্ন প্রকার ক্ষতিকর কল-কারখানার নির্গত গ্যাস এবং ধোঁয়া। যা আমাদের স্বাস্থ্য এবং ফুসফুসের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর সমস্যা বয়ে আনে। কিন্তু এক্ষেত্রে আমাদের শিক্ষিত সমাজ এবং জ্ঞানী ব্যক্তিরা এসব ব্যাপারে একদমই সচেতন নয়।

বায়ুদূষণ আমাদের ফুসফুসের জন্য যেরকম ক্ষতিকর তেমনি জলবায়ুর জন্য মারাত্মক সমস্যা। বায়ুদূষণ হওয়ার ফলে আমাদের ফুসফুসের ক্ষতি তো হচ্ছেই পাশাপাশি জলবায়ুর উপরে খারাপ প্রভাব পড়ছে। যা স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর এবং পরিবেশ পরিস্থিতি খারাপ হওয়ার জন্য দায়ী।

এক্ষেত্রে জলবায়ু ঠিক রাখার জন্য আমাদের প্রত্যেকের সচেতন হওয়া উচিত। কারণ আমাদের বসবাসকৃত পৃথিবী এবং আবহাওয়া আমরা নিজেরাই খারাপ করে দিচ্ছি। এছাড়াও রাস্তাঘাটে প্রতিনিয়ত চলার পথে বিভিন্ন রকম ধোঁয়া এবং ধুলাবালি আমাদের ফুসফুসে প্রবেশ করে।

যা ফুসফুসের জন্য ক্ষতিকারক, এজন্য রাস্তাঘাটে চলার ক্ষেত্রে অবশ্যই মাস্ক ব্যবহার করা উচিত। আমরা বাসায় মশার আক্রমণ থেকে বাঁচার জন্য মশার কয়েল ব্যবহার করি। যা আমাদের ফুসফুসের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর। কিন্তু এ ব্যাপারে মানুষ একদমই সচেতন নয়।

রান্না করার সময় চুলার ধোঁয়া ফুসফুসে প্রবেশ করে যা ফুসফুসের জন্য ক্ষতিকারক। ফুসফুস ভালো রাখতে অবশ্যই আমাদের ফুসফুসের জন্য ক্ষতিকারক বিষয়বস্তুগুলো এড়িয়ে চলা প্রয়োজন। কারণ আজ ফুসফুসে কোনো সমস্যা হচ্ছে না তাই বলে ভবিষ্যতে যে কখনো হবে না এমনটা ভাবা ঠিক নয়।

এজন্য এখন থেকে সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত। কারণ ফুসফুস রোগাক্রান্ত হয়ে গেলে তখন সতর্ক হয়ে ফুসফুস আর কতটাই বা ভালো রাখা যায়। এজন্য সময় থাকতে সচেতন হওয়া উচিত এবং ফুসফুস ভালো রাখার প্রতি সতর্ক হওয়া দরকার।

ফুসফুস ভালো রাখার উপায় : ফুসফুস ভালো রাখার জন্য অবশ্যই প্রথমত আপনাকে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। পাশাপাশি ফুসফুস ভালো রাখার ইচ্ছে থাকলে ধূমপান কখনোই করা যাবে না এবং নেশাদ্রব্য ত্যাগ করতে হবে। অবশ্যই সুষম খাদ্য খেতে হবে, আর খেয়াল রাখতে হবে আপনি যে খাবারগুলো খাচ্ছেন সেগুলো স্বাস্থ্যসম্মত এবং প্রাকৃতিক কিনা।

ধুলাবালি এবং ক্ষতিকর ধোঁয়াগুলো অবশ্যই এড়িয়ে চলতে হবে। অবশ্যই দিনে কিছুটা সময় হলেও মুক্ত বাতাসে নিঃশ্বাস নিতে হবে। পাশাপাশি প্রতিদিন কিছুটা সময় হলেও শারীরিক ব্যায়াম অনুশীলন করা প্রয়োজন। কারণ বিভিন্ন রকমের ব্যায়াম আপনার ফুসফুসের কার্যক্ষমতা ভালো রাখতে সহায়তা করবে এবং আপনার ফুসফুস সুস্থ সবল ও

শক্তিশালী রাখবে। এজন্য ফুসফুস ভালো রাখার ক্ষেত্রে শারীরিক ব্যায়াম অনুশীলনে কখনো অবহেলা করবেন না।

ফুসফুস ভালো রাখতে পরোক্ষ ধূমপান এড়ানো : অবশ্যই যারা ধূমপান করে তাদের থেকে এড়িয়ে চলা ভালো। বিশেষ করে যখন ধূমপান করে তখন ধোঁয়া চারিদিকে ছড়িয়ে যায়। এই ধোঁয়া নিঃশ্বাসের সাথে ফুসফুসে প্রবেশ করলে ফুসফুস ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং ফুসফুস বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকিতে থাকে। যে ব্যক্তি ধূমপান করে সে ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং তার আশপাশে যাদের ফুসফুসে ধোঁয়া প্রবেশ করে তারাও ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

ফুসফুস ভালো রাখতে গাছপালা : গাছ ফুসফুসের বন্ধু বলা চলে কারণ গাছ আমাদের অক্সিজেন প্রদান করে এবং আমরা নিঃশ্বাসের সাথে যে কার্বন ডাই অক্সাইড ত্যাগ করি সেটা গাছ গ্রহণ করে। তাই আমাদের ফুসফুস ভালো রাখার জন্য এবং পরিবেশ ভালো রাখার জন্য গাছ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

গাছ আমাদের বিশুদ্ধ অক্সিজেন সরবরাহ করে এবং আমাদের শরীরের জন্য ক্ষতিকর কার্বন-ডাই অক্সাইড গ্রহণ করে। তাই সুস্থ থাকার জন্য প্রচুর পরিমাণে গাছ লাগান। কথাটা অবশ্যই খুব পরিচিত কিন্তু আমাদের ভেতরে তেমন কোনো লোকই মানেন না এবং আমাদের ভেতরের কম লোকই আছে যাদের গাছের প্রতি এবং প্রকৃতির প্রতি ভালোবাসা রয়েছে।

আর আমরা তো প্রতিনিয়তই গাছ এবং প্রকৃতির ক্ষতি করে চলেছি। আপনার বাড়ির চারপাশে গাছ লাগাতে পারেন। যা আপনাকে অক্সিজেন সরবরাহ করবে এবং আপনার ফুসফুস সুস্থ রাখতে সাহায্য করবে। পাশাপাশি পরিপূর্ণ একটি অক্সিজেন যুক্ত জায়গা আপনার শরীর ও মন দু'টোই ভালো রাখতে সহায়তা করবে।

ফুসফুস ভালো রাখতে অবশ্যই ব্যায়াম করুন : ফুসফুস ভালো এবং সুস্থ-সবল রাখার জন্য ব্যায়াম অনেক উপকারী। প্রতিদিন অন্তত ৩০ মিনিট ব্যায়াম করতে পারেন। ৩০মিনিট ব্যায়াম তেমন বেশি সময় নয় এবং কষ্টসাধ্য নয়। ব্যায়াম করার ফলে আপনার নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস দ্রুত হয়।

এতে আপনার ফুসফুসের ব্যায়াম হয় ফলে ফুসফুস ভালো থাকে। ফুসফুস ভালো থাকার পাশাপাশি ব্যায়ামের রয়েছে হাজারো রকম রোগের উপকারিতা এবং সমাধান।

ফুসফুস ভালো রাখার খাবারসমূহ– অবশ্যই সর্বদা প্রাকৃতিক এবং তাজা খাবার খাওয়ার চেষ্টা করবেন। ভিটামিন সি সমৃদ্ধ এবং ভিটামিন ডি সমৃদ্ধ খাবার খেতে পারেন এবং বিভিন্ন প্রকার মৌসুম প্রিয় ফল ফুসফুসের জন্য অত্যন্ত ভালো। শীতকালীন সবজি হিসেবে টমেটো ফুসফুস ভালো রাখতে এবং বাতাসে থাকা ক্ষতিকর ধূলিকণা হতে রক্ষা করতে সাহায্য করবে। এছাড়াও ফুসফুস ভালো রাখতে বাদাম খেতে পারেন। বাদামে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন ই এবং খনিজ পদার্থসহ নানা রকম স্বাস্থ্যকর উপাদান। যা আপনার ফুসফুস ভালো রাখতে সহায়তা করে এবং শরীরের অনেক উন্নতি ঘটায়।

রসুন-এর সাথে আমরা সবাই পরিচিত, ফুসফুস ভালো রাখার জন্য নিয়মিত রসুন খেতে পারেন। রসুন আপনার ফুসফুস ভালো রাখার পাশাপাশি বিভিন্ন প্রকার ভাইরাসের সংক্রমণ থেকে সুরক্ষিত রাখবে।

ফুসফুস পরিষ্কার এবং সুস্থ রাখতে নিয়মিত মধু খেতে পারেন। পর্যাপ্ত পরিমাণে পানি পান করুন, প্রচুর পরিমাণে পানি আপনার রক্ত চলাচলের মাত্রা সঠিক রাখতে এবং ফুসফুসকে ভালো রাখতে সাহায্য করবে।

ফুসফুস সম্পর্কে অজানা তথ্য :

১. আনুমানিক ফুসফুসের ১০ ভাগ বাতাসে পূর্ণ, কেবল ১০ ভাগ হলো শক্ত কলা।

২. মানবদেহের দু'টি ফুসফুসে ৬০০ মিলিয়ন (৬০ কোটি) অ্যালভিওলাস আছে।

৩. মানুষ প্রতিদিন গড়ে ২৫,০০০ বার শ্বাস গ্রহণ করে।

৪. অক্সিজেন গ্রহণের জন্য প্রতিদিন ৯,০০০ লিটার (১,৯৮০ গ্যালন) রক্ত ফুসফুসের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়।

৫. ফুসফুসের অ্যালভিওলি উন্মুক্ত করে সমতল অবস্থায় রাখলে ১০০ বর্গ মিটার (১,০৭৬ বর্গ ফুট) জায়গা দখল করবে, যা একটি টেনিস কোর্টের সমান।

৬. মানুষ গড়ে প্রতি ১০ সেকেন্ডে ১ লিটার বাতাস গ্রহণ করে ও ত্যাগ করে।

৭. শ্বাস গ্রহণ ও ত্যাগের মাধ্যমে মানুষের দেহ থেকে প্রতিদিন ০.৫ লিটার পানি বেরিয়ে যায়।

৮. স্বাভাবিকভাবে ৩ মিনিট ২০ সেকেণ্ড শ্বাস-প্রশ্বাস বন্ধ থাকলে মৃত্যু নিশ্চিত হয়ে যায়।

৯. হাই তোলা ফুসফুসে অধিক অক্সিজেন আনয়ন করে।

১০. ফুসফুসের প্রসারণ বাইরের বাতাসের তুলনায় ফুসফুসের ভেতরের চাপ কমিয়ে দেয়। ফলে বাইরের বাতাস ফুসফুসের ভেতরে প্রবাহিত হয়।

১১. ফুসফুসের বিশ্রাম তুলনামূলকভাবে বাইরের বাতাসের চাপের চেয়ে ফুসফুসের ভেতরে বাতাসের চাপকে বৃদ্ধি করে। ফলে বাতাস প্রবাহিত হয়। ❑

الفتاوى و المسائل ❖ ফাতাওয়া ও মাসায়িল

জিজ্ঞাসা ও জবাব

ফাতাওয়া বোর্ড, বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আর তোমরা দ্বীনের মধ্যে নতুন সংযোজন করা হতে সাবধান থেকো। নিশ্চয়ই (দ্বীনের মধ্যে) প্রত্যেক নতুন সংযোজন বিদ্'আত, প্রত্যেকটি বিদ্'আতই ভ্রষ্টতা, আর প্রত্যেক ভ্রষ্টতার পরিণাম জাহান্নাম।

(সুনান আন্ নাসায়ী- হা. ১৫৭৮, সহীহ)

জিজ্ঞাসা (০১) : *একজন 'আলেম বলেছেন সালাতে বুকে বা নাভীর নীচে হাত বাধার কোনো সহীহ হাদীস নেই। তার এ কথা কতটুকু সত্য?* *খাইরুল কবীর*
গুরুদাসপুর, নাটোর।

জবাব : সালাতে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে বুকে হাত বাধবে, এ কথা সহীহ হাদীসসমূহে বিদ্যমান। এই মর্মে সহীহুল বুখারীতে বর্ণিত হাদীসটি নিম্নরূপ :

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ : «كَانَ النَّاسُ يُؤْمَرُوْنَ أَنْ يَضَعَ الرَّجُلُ اليَدَ اليُمْنَى عَلَى ذِرَاعِهِ اليُسْرَى فِي الصَّلَاةِ».

সাহ্ল ইবনু সা'দ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, লোকদেরকে নির্দেশ দেয়া হত, মুসল্লী ব্যক্তি যেন সালাতের মধ্যে তার ডান হাত বাম বাহুর উপর রাখে। *(আস্ সহীহুল বুখারী- হা. ৭৪০)*

আলোচ্য হাদীসের আলোকে ডান হাত বাম বাহুর উপর স্থাপন করে বাধতে গেলে তা বুকেই বাধা হবে এতে সন্দেহের অবকাশ থাকে না। তাছাড়াও বুকে হাত বাধার সহীহ হাদীসসমূহ বিদ্যমান রয়েছে। তার মধ্যে অন্যতম হাদীস হলো– সুনান আবূ দাউদ, সুনান আন্ নাসায়ী এবং মুসনাদ আহমাদে বর্ণিত সহীহ হাদীস।

أَنَّ وَائِلَ بْنَ حُجْرٍ أَخْبَرَهُ قَالَ : "قُلْتُ لَأَنْظُرَنَّ إِلَى صَلَاةِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ كَيْفَ يُصَلِّي، فَنَظَرْتُ إِلَيْهِ فَقَامَ فَكَبَّرَ، وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى حَاذَتَا بِأُذُنَيْهِ، ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ اليُمْنَى عَلَى كَفِّهِ اليُسْرَى وَالرُّسْغِ وَالسَّاعِدِ.

ওয়ায়িল ইবনু হুজর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, অবশ্যই আমি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সালাতের দিকে নযর দিতাম। আমি দেখতাম যে, তিনি সালাতে দাঁড়াতেন। অতঃপর তাকবীর বলতেন এবং কান বরাবর দুই হাত উঠাতেন। অতঃপর তাঁর ডান হাত বাম হাতের পাতা, কব্জি এবং বাহুর উপর রাখতেন। *(আবূ দাউদ- হা. ৭২৭; আন্ নাসায়ী- ৮৮৯; আহমাদ- হা. ১৮৮৯০)*

উক্ত হাদীসের বিশুদ্ধতা সম্পর্কে যুগশ্রেষ্ঠ হাদীসবেত্তা ইমাম নাসিরুদ্দিন আলবানী (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন,

رواه ابو داود والنسائ بسند صحيح وهذه الكيفية نشتكرم ان يكون الوضع على الصدر اذا انت تأملت ذلك وعملت بها.

"হাদীসটি সুনান আবূ দাউদ এবং সুনান আন্ নাসায়ী সহীহ সনদে বর্ণনা করেছেন। এই পদ্ধতিই আমাদের উপর আবশ্যক করে যে, হাত বাধতে হবে বুকের উপর, যদি আপনি এটা চিন্তা করেন এবং এর উপর 'আমল করেন।" *(মিশ্কা-তুল মাসা-বীহ- ১/২৪৯ পৃ.)*

এতদ্ব্যতীত তাউস (রাহিমাহুল্লাহ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন :

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «يَضَعُ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى يَدِهِ الْيُسْرَى، ثُمَّ يَشُدُّ بَيْنَهُمَا عَلَى صَدْرِهِ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ».

"রাসূল (ﷺ) সালাতে তাঁর ডান হাত বাম হাতের উপর রাখতেন এবং বুকের উপর শক্ত করে বাধতেন।" *(সুনান আবূ দাউদ- হা. ৭৫৯, সহীহ)*

এই হাদীস প্রসঙ্গে আল্লামা আলবানী (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, তাউস মুরসাল হলেও সকলের নিকট দলিলযোগ্য, কারণ তিনি মুরসাল হলেও সনদের জন্য সহীহ। এছাড়াও এই হাদীস মারফূ হিসেবে অনেকগুলো সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। *(ইরওয়াউল গালীল- ২/৭১ পৃ.)*

পক্ষান্তরে নাভীর নীচে হাত বাধা বিষয়ে কোনো সহীহ হাদীস বর্ণিত নেই।

জিজ্ঞাসা (০২) : *আমি শুনেছি, প্যান্ট বা শার্ট কিংবা পাঞ্জাবীর হাতা গুটানো অবস্থায় সালাত আদায় করলে সে সালাত হবে না। আমার শুনা কি সঠিক?* *জয়নুল আবেদীন*
গোদগাড়ী, রাজশাহী।

জবাব : কাপড় গুটানো বা ভাজ করা অবস্থায় সালাত আদায় করা মাকরূহ বা অপছন্দনীয় কাজ। তবে এ কারণে সালাত হবে না –এমন বক্তব্য সঠিক নয়। প্যান্ট, লুঙ্গি, পাজামা, জুব্বা যাই হোক টাকনোর নিচে ঝুলে পড়া হারাম। মহানবী (ﷺ) ইরশাদ করেছেন,

«مَا أَسْفَلَ مِنَ الكَعْبَيْنِ مِنَ الإِزَارِ فَفِي النَّارِ».

ইযার (লুঙ্গি) টাকনোর যতখানি নিচে পড়বে, ততখানি জাহান্নামের আগুনে যাবে। *(সহীহুল বুখারী- হা. ৫৭৮৭)*

নবী (ﷺ) আরো ইরশাদ করেছেন :

وَإِيَّاكَ وَإِسْبَالَ الْإِزَارِ، فَإِنَّهَا مِنَ الْمَخِيْلَةِ، وَإِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ الْمَخِيْلَةَ.

লুঙ্গি ঝুলিয়ে পরিধান হতে বেঁচে থাকো, কেননা নিশ্চয়ই তা গর্ব-অহংকারের অন্তর্ভুক্ত; আর আল্লাহ তা'আলা গর্ব-অহংকারকে পছন্দ করেন না। *(আবূ দাঊদ- হা. ৪০৮৪, সহীহ)*

লুঙ্গি, প্যান্ট-পাজামা টাকনোর নিচে পরিধান করা চরমভাবে নিষিদ্ধ, আবার সালাতে কাপড় গুটিয়ে রাখাও নিষিদ্ধ। টাকনোর নিচে কাপড় পরিধান করা সালাত কিংবা সালাতের বাইরে সর্বাবস্থায় পুরুষের জন্য নিষিদ্ধ।

এই বিষয়ে সমন্বয়মূলক বক্তব্য রেখে ইমাম নব্বী (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, কাপড় গুটিয়ে সালাত আদায় করা সকল 'আলেমের ঐকমত্যে নিষিদ্ধ। এটা মাকরূহ তানযিহী পর্যায়ের। যদি কেউ এভাবে সালাত আদায় করে তবে তা নিন্দনীয় হবে এবং সালাত শুদ্ধ হবে না। *(তুহফাতুল মিনহাজ- ইমাম নব্বী, ২য় খণ্ড, ১৬১-১৬২ পৃ.)*

বিশ্বখ্যাত ফাতাওয়া আল লাজনা আদ্ দায়িমার মধ্যে উল্লেখ রয়েছে– "টাকনোর নিচে কাপড় ঝুলিয়ে পরিধান পূর্বক সালাত আদায় করা বৈধ নয়। ব্যক্তির উপর ওয়াজিব হলো তার কাপড় টাকনোর উপর থেকে নিয়ে পায়ের নলার অর্ধাংশে রাখা। যদি এটি সম্ভবপর না হয় তবে সে ব্যক্তি সালাতে প্রবেশের পূর্বে তার প্যান্ট উপরে উঠাবে যাতে তা টাকনোদ্বয়ের উপরে থাকে।" *(ফাতাওয়া আল লাজনা আদ্ দায়িমা- ফা. নং- ১৯৪৯৭)*

জিজ্ঞাসা (০৩) : অনেকে ভাবে যে, "আল্লাহ গাফুরুর রাহীম, তিনি সব মাফ করে দিবে"– এজন্য পাপ করার ক্ষেত্রে কোনো বাধা মানে না। বিষয়টি কি আসলে এমনই?

ইসহাক আরমান
যাত্রাবাড়ি, ঢাকা।

জবাব : নির্বিঘ্নে পাপ কাজ করে মহান আল্লাহর ক্ষমা অবধারিত ভেবে নেয়া মনগড়া, কল্পনা এবং গোমরাহ চিন্তা ছাড়া অন্য কিছু নয়। এমন অবারিত সুযোগ আল্লাহ দিয়ে রাখেননি যে, বান্দারা নিশ্চিন্তে পাপ করে যাবে, আর আল্লাহ সব ক্ষমা করে দিবেন। এসব চিন্তাধারা শয়তানের আশ্বাস এবং ওয়াসওয়াসা। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا﴾

"সে (শয়তান) তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দেয় এবং তাদেরকে আশ্বাস দেয়। শয়তান তাদের যে প্রতিশ্রুতি দেয়, তা সব প্রতারণা ছাড়া অন্য কিছু নয়।" *(সূরা আন্ নিসা : ১২০)*

অথচ আল্লাহ তা'আলার দ্ব্যর্থহীন ঘোষণা হলো–

﴿نَبِّئْ عِبَادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ○ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ﴾

"আমার বান্দাদের জানিয়ে দাও নিশ্চয়ই আমি ক্ষমাশীল, দয়াবান এবং নিশ্চয়ই আমার 'আযাব যন্ত্রণাদায়ক 'আযাব।" *(সূরা আল হিজ্‌র : ৪৯-৫০)*

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন :

﴿اعْلَمُوا أَنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ وَأَنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾

"তোমরা জেনে রাখো, আল্লাহ শাস্তি দানের ব্যাপারে কঠোর এবং আল্লাহ অত্যন্ত ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।" *(সূরা আল মায়িদাহ্ : ৯৮)*

সুতরাং সকলের উচিত মহান আল্লাহকে ভয় করে চলা, তার ফর্‌য ও ওয়াজিবকৃত বিষয়গুলোকে মেনে চলা এবং তার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করা।

জিজ্ঞাসা (০৪) : আমি হাতে নেলপলিশ ব্যবহার করি। এই নেলপলিশ ব্যবহার করে ওযূ করলে ওযূ হবে কী? *সুলতানা খুলনা।*

জবাব : হাতে, পায়ের নখে নেলপলিশ লাগানো অবস্থায় ওযূ করলে, ওযূ হবে না, ফলে নেলপলিশ ব্যবহার করলে সালাতও হবে না। নখ পলিশের মাধ্যমে নখে এমন আবরণ সৃষ্টি হয় যাতে ওযূর পানি প্রকৃত নখে পৌঁছতে ব্যর্থ হয়। অথচ আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন,

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ...﴾

"হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা যখন সালাতের জন্য তৈরি হবে তখন তোমরা তোমাদের মুখমণ্ডল ও হাত কনুই পর্যন্ত ধুয়ে নিবে এবং তোমাদের মাথা মাসাহ করবে এবং পা টাকনো পর্যন্ত ধুয়ে নিবে...– *(সূরা আল মায়িদাহ্ : ৬)*।" নেলপলিশ হাতে, পায়ে ব্যবহার করলে ওযূ এমনকি গোসলেও হাতে, পায়ের নখে পানি পৌঁছবে না। নেলপলিশ আবরণ হয়ে নখে পানি পৌঁছাতে বাধা দিবে। তাতে হাত ও পা ধোয়ার উদ্দেশ্য অর্জিত হবে না।

জিজ্ঞাসা (০৫) : আমি কুরআন কারীমের কিছু মূল্যবান দু'আ জানি। সাজদায় গিয়ে সে দু'আগুলো পড়তে খুব ইচ্ছা করে। কিন্তু শুনেছি সাজদায় কুরআন পড়া নিষেধ, এমতাবস্থায় আমি কি কুরআনের দু'আগুলো সাজদায় পড়তে পারব না?

আশ্রাফুল ইসলাম
বিরল, দিনাজপুর।

জবাব : রুকূ‘ এবং সাজদাতে স্বাভাবিকভাবে কুরআন তিলাওয়াত করার নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। তবে দু‘আ হিসাবে কুরআন কারীমের দু‘আমূলক আয়াত থেকে পড়া বৈধ রয়েছে। রুকূ‘ এবং সাজদাতে কুরআন তিলাওয়াত নিষেধ হওয়া বিষয়ে নাবী (ﷺ)-এর ইরশাদ নিম্নরূপ :

عَنْ عَلِيِّ بْنَ أَبِيْ طَالِبٍ، قَالَ : «نَهَانِيْ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَنَّ أَقْرَأَ رَاكِعًا أَوْ سَاجِدًا».

“‘আলী ইবনু আবী ত্বালিব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) রুকূ‘ এবং সাজদাহ্ অবস্থায় কুরআন তিলাওয়াত করতে আমাকে নিষেধ করেছেন।” *(সহীহ মুসলিম- হা. ৪৮০)*

এর অন্তর্নিহিত কারণ প্রসঙ্গে শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনু তাইমিয়্যাহ্ (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, “কারণ হলো কুরআন হলো মহান আল্লাহর বাণী, শ্রেষ্ঠ বাণী, আর রুকূ‘ ও সাজদার অবস্থাটি হলো বান্দার নিচু এবং ক্ষুদ্র হওয়ার একটা চরম অবস্থা। বিধায় এ দু’ অবস্থায় কুরআন তিলাওয়াত না করাই আদবপূর্ণ।” *(মাজমূ‘ আল ফাতাওয়া- ৫/৩৩৮)*

তবে সাজদাহ্ অবস্থায় দু‘আর বিষয়টি বান্দার নম্রতার সাথে আর দু‘আ ও তিলাওয়াত অনেকটা ভিন্ন বিষয়, বিধায় সাজদাহ্ অবস্থায় কুরআন তিলাওয়াত বৈধ রয়েছে। বিশ্বখ্যাত ফাতাওয়া আল্ লাজনা আদ্ দায়িমা গ্রন্থে এ বিষয়ে নিম্নোক্ত বক্তব্য রয়েছে।

لَا بَأْسَ بِذلك إذا أَتَى بِهَا عَلَى وَجْهِ الدعَاءِ لَا عَلَى وَجْهِ التِّلَاوَةِ لِلْقُرْآنِ.

“তিলাওয়াত হিসাবে না করে (সাজদাতে) দু‘আ হিসাবে কুরআন পড়াতে কোনো সমস্যা নেই।” *(ফাতাওয়া আল লাজনা আদ্ দায়িমা- ৬/৪৪৩)*

জিজ্ঞাসা (০৬) : ***স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক মিলনের পূর্বে যে দু‘আ পড়তে হয়, তা কেবল স্বামী পড়লেই চলবে না-কি স্ত্রীকেও পড়তে হবে?***

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক।

জবাব : স্বামী-স্ত্রীর মিলনের প্রাক্কালে পঠিতব্য দু‘আ স্বামী যেমন পড়বে তেমনি স্ত্রীও পড়বে। স্বামী-স্ত্রী উভয়ের মিলনের পূর্বে পঠনীয় দু‘আ প্রসঙ্গে হাদীস নিম্নরূপ :

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضي الله عنهما)، قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : "لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْتِيَ أَهْلَهُ قَالَ : بِاسْمِ اللهِ، اَللّٰهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ، وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا، فَإِنَّهُ إِنْ يُقَدَّرْ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ فِيْ ذَلِكَ لَمْ يَضُرَّهُ شَيْطَانٌ أَبَدًا".

“ইবনু ‘আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। নবী (ﷺ) বলেন : তোমাদের কেউ তার সহধর্মিনীর কাছে আসলে সে যেন বলে, মহান আল্লাহর নামে শুরু করছি। হে আল্লাহ! তুমি আমাদেরকে এবং আমাদের যে দান করবে তাকে শয়তান থেকে রক্ষা করো। তাতে তাদের যদি সন্তান আল্লাহ তা‘আলা নির্ধারণ করেন, শয়তান তাকে কখনো ক্ষতি করতে পারবে না।” *(বুখারী- হা. ৬৩৮৮, মুসলিম- হা. ১৪৩৪)*

হাদীসের ব্যাখ্যা ইমাম নববী (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, সব ধরণের অনিষ্ট, ওয়াসওয়াসা, ধোকা থেকে রক্ষা পাবে।” *(শরহে সহীহ মুসলিম- ৫/১০)*

হাদীসের প্রকাশ্য অর্থে কেবল পুরুষের জন্য দু‘আটি পঠনীয় হলেও, বিধানের বেলায় নারী-পুরুষের অন্তর্ভুক্ত থাকে, বিধায় স্ত্রীও দু‘আটি পাঠ করবে।

জিজ্ঞাসা (০৭) : ***সালাতুল বিত্র কি ‘ইশার সালাতের অংশ? অনেকে মনে করেন– বিতর সালাত আদায় না করলে ‘ইশার সালত শুদ্ধ হয় না। আসলে বিষয়টি কি? ব্যাখ্যা দিয়ে ধন্য করবেন।***

মো. আব্দুল্লাহ
জয়দেবপুর, গাজীপুর।

জবাব : না, বিত্র ‘ইশার সালাতের অংশ নয়। মূলতঃ বিত্র হলো রাতের শেষ সালাত। কুরআন-সুন্নাহ মতে সূর্যাস্তের পর হতে রাত শুরু। আর রাতের সালাত বেজোড় সংখ্যা দিয়ে শুরু হয় এবং বেজোড় সালাত দিয়ে সমাপ্ত করতে হয়। একটু লক্ষ্য করলে দেখতে পাব মাগরিবের ফর্‌য বেজোড় এবং বিত্র বেজোড়। আর বিত্র-এর ওয়াক্ত আরম্ভ হয় ‘ইশার সালাতের পর এবং শেষ ওয়াক্ত হচ্ছে সুবেহ সাদিক্বের পূর্ব পর্যন্ত– *(মুসনাদ আহমাদ, আল-বানী ‘ইরওয়া- হা. ৪২৩, সহীহ)*। এ সালাত শেষ রাত্রে পড়াই উত্তম– *(সহীহুল বুখারী- হা. ৯৯৮ ও সহীহ মুসলিম- হা. ৭৫১)*।

তবে রাতে জাগ্রত না হওয়ার আশংকা থাকলে ‘ইশার পর ঘুমাবার আগে আদায় করা বিধিসম্মত। *(সহীহুল বুখারী- হা. ১১৩৭, সহীহ মুসলিম- হা. ৭২১)*

জিজ্ঞাসা (০৮) : ***আমাদের সমাজে প্রচলিত আছে যে, ‘ওয়াসকুরুনী’ বা ‘ওয়েযকুরুনী’ ওহুদ যুদ্ধে রাসূল (ﷺ)-এর দাঁত ভেঙ্গে যাওয়ার খবর শুনে তিনি না-কি তাঁর দাঁত ভাঙ্গা শুরু করেন। তিনি নিশ্চিত হতে পারেননি, রাসূল (ﷺ)-এর কোন দাঁত ভেঙ্গে ছিল। তাই সন্দেহ এড়াতে তিনি একে একে তাঁর সবক‘টি দাঁত ভেঙ্গে রাসূল (ﷺ) প্রেমের প্রমাণ দিয়ে ছিলেন– এটা কতটুকু সত্য?***

খালেদুর রহমান
নোয়াপাড়া, যশোর।

জবাব : আসলে এটি একটি বহুল প্রচলিত বানোয়াট ও ভিত্তিহীন কল্পকাহিনী। মূলতঃ তাঁর নাম উয়াইস পিতা আবূ ‘আম্‌র/আবূ ‘আমের আল-ক্বারনী। তিনি ইয়ামানের

বাসিন্দা ছিলেন। রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নবুওয়্যাত কাল পেলেও নিজ মায়ের সেবার বাধ্যবাধকতা থাকার কারণে তাঁর (ﷺ) সাথে সাক্ষাৎ করতে পারেননি। তবে অনেক সাহাবী (রাযিয়াল্লাহু আনহুম)-এর সান্নিধ্য পাওয়ার কারণে তাকে একজন বিশিষ্ট তাবেঈ হিসেবে অ্যাখ্যায়িত করা হয়। সহীহ মুসলিমে বর্ণিত রয়েছে যে, খলিফা 'উমার ইবনুল খাত্তাব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) ইয়ামানে পৌঁছিয়ে জিজ্ঞেস করেছিলেন– তোমাদের মাঝে কি উয়াইস ইবনু 'আমের আছে। অতঃপর তিনি তার সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং তার কাছে দু'আ চান। আর বলেন : রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এই মর্মে তার কাছে দু'আ চাইতে পরামর্শ দিয়েছেন। *(সহীহ মুসলিম- হা. ২৫৪২)*

জিজ্ঞাসা (০৯) : আমি যে প্রতিষ্ঠানে চাকরি করি সেখানে সুদের লেন-দেন হয়। এ নিয়ে আমার মনে সংশয় কাজ করে। এ ব্যাপারে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি কী? *চণ্ডিপুর ঝিনাইদহ।*

জবাব : সুদের লেন-দেনের প্রতিষ্ঠানে চাকরি করা বৈধ নয়, সেটি ব্যাংক, বীমা বা অন্য যে কোনো ধরনের প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা হোক। এই কাজ পাপ ও সীমা লংঘনের সাহায্য করার অন্তর্ভুক্ত। এ মর্মে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَتَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰى وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوْا اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ﴾

অর্থ : "তোমরা পুণ্য ও আল্লাহভীতি কাজে পরস্পর সহযোগিতা করো, এবং পাপ ও সীমা সঙ্ঘনের কাজে পরস্পর সহযোগিতা করো না। তোমরা আল্লাহকে ভয় করো। নিশ্চয় আল্লাহ শাস্তি দানে কঠোর।" *(সূরা আল মায়িদাহ : ২)*

সুদ ভয়াবহ ধ্বংসাত্মক পাপ। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) সুদের বিরাট পাপের কথা বলেছেন নিম্নোক্ত হাদীসে–

«دِرْهَمٌ رِبًا يَأْكُلُهُ الرَّجُلُ وَهُوَ يَعْلَمُ أَشَدُّ مِنْ سِتَّةٍ وَثَلَاثِيْنَ زِيْنَةً».

অর্থ : "সুদের একটি দিরহাম (টাকা) জেনে শুনে কোনো ব্যক্তি খেলে তা ছত্রিশবার ব্যভিচার করার চেয়েও মারাত্মক।" *(মুসনাদ আহমদ- হা. ৫/২২৫, মা. শা., হা. ২১৯৫৭; সহীহুল জামি'- আল্লামা আলবানী, হা. ৩৩৭৫)*

সুদের সর্ববিধ পাপের কথা মহানবী (ﷺ)-এর হাদীসে এভাবে এসেছে–

«لَعَنَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ آكِلَ الرِّبَا، وَمُؤْكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَقَالَ : «هُمْ سَوَاءٌ».

অর্থ : "রাসূলুল্লাহ (ﷺ) অভিশম্পাত করেছেন সুদখোর, সুদদাতা, সুদের লেখক ও সুদের সাক্ষী দু'জনকে। তিনি আরও বলেন, তারা সমান অপরাধী।" *(সহীহ মুসলিম- হা/১৫৯৮, সুনান আবূ দাউদ- হা. ৩৩৩৩)*

আল্লামা বিন বায (রাহিমাহুল্লাহ) সুদি কাজ কারবারে কোনোরূপ সাহায্য সংস্রব প্রসঙ্গে বলেন, "এটা পরিজ্ঞাত যে, সুদ সবচেয়ে বড় পাপগুলোর অন্যতম। সুদী কারবার ও এর প্রতিষ্ঠানের সাথে সাহায্য ও সহযোগিতার সম্পর্ক রাখা অবৈধ।" *(কিতাবুদ দা'ওয়াত- শাইখ বিন বায : ১/১৪৬)*

জিজ্ঞাসা (১০) : জনৈক কবিরাজ জিন্ হাজির করে চিকিৎসা করে থাকে। এ জাতীয় কবিরাজের চিকিৎসা নেয়া যাবে কি? *আশরাফুল আলম চৌড়হাস, কুষ্টিয়া।*

জবাব : জিন্ ধরা, জাদুগ্রস্ত ইত্যাদি রোগী ব্যক্তিকে কুরআনের আয়াত এবং বৈধ উপায়ে চিকিৎসা দেয়া সঠিক। জিন্ হাজির করে তাদের শরনাপন্ন হয়ে অজ্ঞাত সব পদ্ধতির চিকিৎসা জায়িয নয়। প্রকৃতপক্ষে এ সকল পদ্ধতি অবলম্বন গাইরুল্লাহকে আহ্বানের শামিল এবং গাইরুল্লাহর কাছে সাহায্য চাওয়ার মধ্যে গণ্য যা হারাম। জাবির (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,

سُئِلَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنِ النُّشْرَةِ فَقَالَ : «هُوَ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ».

অর্থ : "নবী (ﷺ)-কে জাদু, জিন্, গণক ইত্যাদির চিকিৎসা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, এ হলো শয়তানের কাজ।" *(আহমদ- ৩/২৯৪, আবূ দাউদ- হা. ৩৮৬৮)*

সকল রোগের চিকিৎসা কুরআন হাদীসের দেখানো দু'আ এবং চিকিৎসা বিজ্ঞানের পরিগৃহিত ব্যবস্থাপনার আলোকে হতে হবে। জিনের আশ্রয় গ্রহণ, জাদুকরের শরণাপন্ন হওয়া এবং হারাম দ্রব্য দিয়ে চিকিৎসা নেয়া ইত্যাদী সবই অবৈধ পন্থা। এ প্রসঙ্গে নবী (ﷺ)-এর ইরশাদ হলো–

«لَا بَأْسَ بِالرُّقَى مَا لَمْ تَكُنْ شِرْكًا».

অর্থ : "ঝাড়ফুঁকের চিকিৎসায় সমস্যা নেই, তাতে শির্ক না থাকলে।" *(মুসলিম- হা. ২২০০, সুনান আবূ দাউদ- হা. ৩৮৮৬)*

নবী (ﷺ) আরও বলেন,

عِبَادَ اللهِ تَدَاوَوْا، «وَلَا تَدَاوَوْا بِحَرَامٍ».

অর্থ : "আল্লাহর বান্দাগণ! তোমরা চিকিৎসা গ্রহণ করো, তবে তোমরা হারাম দ্বারা চিকিৎসা গ্রহণ করো না।" *(সুনান আবূ দাউদ- হা. ৩৮৭৪)*

প্রচ্ছদ রচনা

যে মসজিদের সাদা মিনারের উপরে অবতরণ করবেন 'ঈসা (আলাইহিস সালাম)

–আব্দুল মোহাইমেন সাআদ*

ভূমধ্যসাগরের তীরে অবস্থিত সিরিয়ার রাজধানী দামেস্কের পুরাতন শহরে অবস্থিত ইসলামী ও উমাইয়াহ্ স্থাপত্যকলার এক অনন্য নিদর্শন এই দৃষ্টিনন্দন উমাইয়া মসজিদ (গ্রেট মস্ক অব দামাসকাস নামেও পরিচিত)। এটি মুসলিম বিশ্বের বৃহত্তম এবং প্রাচীন মসজিদগুলোর মধ্যে অন্যতম। এই মসজিদের দক্ষিণ-পূর্ব দিকে অবস্থিত সাদা মিনারের উপরে 'ঈসা (আলাইহিস সালাম) কিয়ামতের পূর্বে অবতরণ করবেন। মসজিদটি মুসলিম ও খ্রিষ্টান উভয়ই ধর্মাবলম্বীদের জন্য পবিত্র ও সম্মানজনক স্থান। তাছাড়া এ মসজিদে বসে পণ্ডিত ইবনু তাইমিয়্যাহ্ (রাহিমাহুল্লাহ) কুরআনের ব্যাখ্যা করতেন মানুষের কাছে।

ইতিহাস : যে স্থানে আজকের উমাইয়াহ্ মসজিদ নির্মিত সে স্থানটি প্রাচীনকাল থেকে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বিশেষ করে মূর্তি পূজারীদের উপাসনালয় হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। মসজিদ নির্মাণের হাজার বছর আগে থেকে এখানে বিভিন্ন দেবতার উপাসনা করা হতো। দীর্ঘকাল ধরে এখানে ছিল রোমনাদের জুপিটার মন্দির। তারপর ৩৯১ খ্রিষ্টাব্দে জুপিটার মন্দিরকে খ্রিষ্টান চার্চে পরিণত করে খ্রিষ্টানরা চার্চটি ইয়াহিয়া (আলাইহিস সালাম)-এর নামে উৎসর্গ করে। বর্তমানে মসজিদটির অভ্যন্তরে রয়েছে ইয়াহইয়া (আলাইহিস সালাম)-এর কবর। ৬৩৪ খ্রিষ্টাব্দে খালিদ ইবনু আল ওয়ালিদের নেতৃত্বে দামেস্ক জয় হওয়াপর ৬৬১ খ্রিষ্টাব্দে ইসলামী খেলাফত উমাইয়াহ্ বংশের অধীনে আসে। এরপর দামেস্ক হয় মুসলিম বিশ্বের প্রশাসনিক রাজধানী। ষষ্ঠ উমাইয়াহ্ খলিফা প্রথম আল ওয়ালিদ ৭০৫ খ্রিষ্টাব্দে এখানে মসজিদ নির্মাণের সিদ্ধান্ত নেন। মসজিদটি যখন নির্মাণ করা হয় তখন এটি ছিল বিশ্বের অন্যতম ব্যয়বহুল একটি প্রকল্প। তৎকালীন বাইজানটাইন, ভারত, ইরান, গ্রিস ও মরক্কো থেকে ১২ হাজার দক্ষ কারিগর সংগ্রহ করা হয় মসজিদের স্থাপত্যশৈলীর জন্য। মসজিদের নির্মাণ কাজ শেষ হয় ৭১৫ খ্রিষ্টাব্দে। ৭৫০ খ্রিষ্টাব্দে উমাইয়াদের পতনের পর 'আব্বাসীয়রা ক্ষমতায় আসলে ইসলামী খেলাফতের রাজধানী হয় বাগদাদ। পরবর্তীতে মিসরের ফাতিমীদের দখলে আসে দামেস্ক শহর। তারপর ক্রুসেডের সময় দামেস্ক শহরের আধিপত্য নিয়ে খ্রিষ্টান ও মুসলমানদের মধ্যে লড়াই চলে। দখল-পাল্টা দখলে বিভিন্ন সময় ক্ষতিগ্রস্ত হয় মসজিদটি। বিশেষ করে ১৪০০ খ্রিষ্টাব্দে তিমুর দামেস্ক নগরী পুড়িয়ে দেয়ার আদেশ দিলে মসজিদের মূল গম্বুজসহ একটি মিনার পুরোপুরি ধ্বংস হয়ে যায়। বিভিন্ন সময় মসজিদটি যেমন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তেমনি বিভিন্ন সময় মুসলিম শাসকরা এই মসজিদের সংস্কার কাজও করেছেন। উসমানীয়দের পর সর্বশেষ বড় আকারে মসজিদটির সংস্কার করেন সিরিয়ার বাদশা হাফিজ আল আসাদ। মসজিদের আদি অলঙ্করণ এবং সাজসজ্জা আজও মুগ্ধ করে দর্শকদের। মসজিদটি বর্তমানে সিরিয়ার অন্যতম একটি দর্শনীয় স্থান।

উমাইয়াহ্ মসজিদের অবকাঠামো : উমাইয়াহ্ মসজিদটি আকারে আয়তক্ষেত্র যার দৈর্ঘ্য ৯৭ মি. এবং প্রস্থ ১৫৬ মি.। মসজিদ কমপ্লেক্সের উত্তরাংশ জুড়ে রয়েছে একটি বৃহৎ আঙিনা এবং দক্ষিণাংশে হারাম অবস্থিত। মসজিদের প্রাচীরকে ঘিরে আছে তোরণ যা দাঁড়িয়ে আছে অতিরিক্ত পাথরের কলাম ও জোড়-স্তম্ভ দ্বারা। ১৭৫৯ খ্রিষ্টাব্দের ভূমিকম্পে মসজিদ প্রাঙ্গনের উত্তরাংশ ধ্বসে যাওয়ার কারণে প্রত্যেক দুই কলামের মধ্যে একটি করে জোড়-স্তম্ভ বিদ্যমান। মসজিদটির প্রধান কক্ষের উপরে কেন্দ্রীয় অভ্যন্তরীণ তোরণের উপর অবস্থিত সর্ববৃহৎ পাথরের তৈরী ৩৬ মি. উচ্চতার গম্বুজটি ডোম অব ঈগল নামে পরিচিত যার আসল নাম কুব্বাত আন-নিস্র। উমাইয়াহ্ মসজিদ কমপ্লেক্সে মোট তিনটি মিনার আছে। মসজিদের উত্তরদিকের দেয়ালে অবস্থিত প্রথম নির্মিত মিনার হল মাধানাত আল-আরুস এবং দক্ষিণ-পূর্ব দিকে অবস্থিত সবচেয়ে উচ্চতম সাদা মিনার "মাধানাত 'ঈসা" এটির উপরে অবতরণ করবেন 'ঈসা (আলাইহিস সালাম)। যার উচ্চতা প্রায় ৭৭ মি. কয়েকটি উৎস হতে জানা যায় মিনারটি ৯ম শতকে 'আব্বাসীদের শাসনামলে নির্মিত হয় কিন্তু এর বর্তমান অবস্থার মিনারটি ১২৪৭ খ্রিষ্টাব্দে নির্মিত হয়। ১৪৮৮ খ্রিষ্টাব্দে মামলুক সুলতান কাইতবাঈ-এর নির্মিত মসজিদের তৃতীয় মিনারটি মাধানাত আল-ঘারবিয়্যা যা (Minaret of Qaitbay) নামেও পরিচিত।

হাদীসে উমাইয়াহ্ মসজিদের সাদা মিনারের উল্লেখ : আবূ খাইসামাহ, যুহায়র ইবনু হারব, মুহাম্মাদ ইবনু মিহরান আর রাযী (রাহিমাহুল্লাহ) ... নাওওয়াস ইবনু সাম'আন (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন, আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন 'ঈসা ইবনু মারইয়াম (আলাইহিস সালাম)-কে প্রেরণ করবেন। তিনি দু'ফেরেশ্তার কাঁধের উপর ভর করে ওয়ারস ও জাফরান রং-এর জোড়া কাপড় পরিহিত অবস্থায় দামেস্ক নগরীর পূর্ব দিকের উজ্জ্বল (সাদা) মিনারে অবতরণ করবেন। যখন তিনি তার মাথা ঝুঁকবেন তখন ফোটা ফোটা ঘাম তার শরীর থেকে গড়িয়ে পড়বে। তিনি যে কোনো কাফিরের কাছে যাবেন সে তার শ্বাসের বাতাসে ধ্বংস হয়ে যাবে। তার দৃষ্টি যতদূর পর্যন্ত যাবে তাঁর শ্বাসও ততদূর পর্যন্ত পৌঁছবে। তিনি দাজ্জালকে সন্ধান করতে থাকবেন। অবশেষে তাকে বাবে লুদ নামক স্থানে গিয়ে পাকড়াও করবেন এবং তাকে হত্যা করবেন। ❑

* *শিক্ষার্থী, কবি নজরুল সরকারি কলেজ, ঢাকা।*

আলোকিত ভুবন

প্রসঙ্গ : আল কুরআন

গ্রন্থনা : আবু ফাইয়ায মুহাম্মদ গোলাম রহমান

❖ আল কুরআনের পরিচয়?

✍ পবিত্র কুরআন সুমহান আল্লাহর পক্ষ থেকে নাযিলকৃত সর্বশ্রেষ্ঠ আসমানী কিতাব, যা সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর উপর তেইশ বছরব্যাপী পর্যায়ক্রমে, প্রয়োজনমাফিক অল্প অল্প করে অবতীর্ণ হয়েছে। পবিত্র কুরআনের ভাষা ও ভাবগর্ভ মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে।

❖ পবিত্র কুরআনের মৌলিক বিশেষত্ব কী?

✍ পবিত্র কুরআন আল্লাহ তা'আলার কালাম বা বাণী; এটি মাখলুক বা সৃষ্টবস্তু নয়। সুতরাং তা আল্লাহ তা'আলার সিফাতের অংশ।

❖ কীভাবে এ পৃথিবীতে পবিত্র কুরআনের আগমন ঘটেছে?

✍ ফেরেশ্তা জিবরাঈল (আলাইহিস্ সালাম)-এর মাধ্যমে, সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী মুহাম্মদ (ﷺ)-এর প্রতি পর্যায়ক্রমে ২৩ বছর ধরে পবিত্র কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে।

❖ পৃথিবীতে আগমনের পূর্বে পবিত্র কুরআনের বাণীসমূহ কোথায় সংরক্ষিত ছিল?

✍ পৃথিবীতে আগমনের পূর্বে পবিত্র কুরআন সুরক্ষিত ফলক 'লাউহে মাহফুয'-এ সংরক্ষিত ছিল।

❖ পবিত্র কুরআন আরবি ভাষায় অবতীর্ণ হয়েছে কেন?

✍ মানুষ যেন সহজেই তা উপলব্ধি করতে পারে, এজন্যই পবিত্র কুরআন আরবি ভাষায় অবতীর্ণ হয়েছে।

❖ পবিত্র কুরআন সর্বপ্রথম কখন এবং কোথায় অবতীর্ণ হয়েছে?

✍ ৬১০ খ্রিষ্টাব্দে রমাযান মাসের এক মহিমান্বিত রাতে (কদরের রাতে); মক্কাতুল মুকাররমার জাবালে নূর বা নূর পর্বতের 'হেরা গুহা'য় ধ্যানমগ্ন মুহাম্মদ (ﷺ)-এর উপর অবতীর্ণ হয়।

❖ পবিত্র কুরআনের কোন আয়াত সর্বপ্রথম অবতীর্ণ হয়?

✍ সূরাতুল আলাক-এর প্রথম পাঁচ আয়াত– "ইকরা বিস্মি রব্বিকাল্-লাযী খলাক্ব..."।

❖ মানবজাতির প্রতি আল কুরআনের প্রথম উপদেশ কী?

✍ প্রথম উপদেশ হলো– "পড়ো তোমার প্রভুর নামে, যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন।"

❖ পবিত্র কুরআনে সর্বশেষ নাযিলকৃত আয়াত কোনটি?

✍ সূরাতুল মায়িদার ০৩ নম্বর আয়াতের শেষাংশ– "আল ইয়াউমা আকমালতু লাকুম... ইসলা-মা দী-না"।

❖ পবিত্র কুরআন প্রথম যুগে কীভাবে সংরক্ষিত ছিল?

✍ প্রথমতঃ সাহাবায়ে কিরামের স্মৃতিতে। এছাড়াও চামড়া, হাড়, পাতা এবং পাথরে লিখিত অবস্থায়।

❖ পবিত্র কুরআনের সর্বপ্রথম ও সর্বশেষ সূরার নাম কী?

✍ সর্বপ্রথম 'সূরাতুল ফাতিহাহ্' এবং সর্বশেষ 'সূরা আন্ নাস'।

❖ কোন্ সূরাকে কুরআনের জননী বলা হয়?

✍ 'সূরাতুল ফাতিহাহ্'কে উম্মুল কুরআন বা কুরআনের জননী বলা হয়।

❖ পবিত্র কুরআনের সর্ববৃহৎ সূরার নাম কী এবং আয়াত সংখ্যা কয়টি?

✍ সর্ববৃহৎ সূরার নাম 'সূরাতুল বাকারাহ্' এবং আয়াত সংখ্যা ২৮৬টি।

❖ পবিত্র কুরআনের সর্বমোট সূরা ও আয়াত সংখ্যা কতটি?

✍ সূরা সংখ্যা ১১৪টি এবং আয়াত সংখ্যা ৬২৩৬টি। তবে প্রতি সূরার সূচনা আয়াত 'বিস্মিল্লা-হির রহমা-নির রহীম'সহ সর্বমোট আয়াত সংখ্যা (৬২৩৬+১১৩) ৬৩৪৯টি।

❖ পবিত্র কুরআনের কোন সূরার শুরুতে 'বিস্মিল্লা-হির রহমানির রহীম' নেই?

✍ সূরা 'আত্ তাওবাহ্'র সূচনায় 'বিস্মিল্লা-হির রহমা-নির রহীম' নেই।

❖ পবিত্র কুরআনের কোন সূরায় বিস্মিল্লা-হির রহমা-নির রহীম দুইবার এসেছে?

✍ সূরা আন্ নামল-এর শুরুতে ও ৩০ নম্বর আয়াতে 'বিস্মিল্লা-হির রহ্মা-নির রহীম' এসেছে।

❖ প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের পর কোন্ আয়াত তিলাওয়াত করলে মৃত্যুবরণের সাথে সাথে জান্নাত পাওয়া যাবে?

✍ 'আয়াতুল কুরসী' (সূরাতুল বাক্বারার ২৫৫ নম্বর আয়াত)।

❖ পবিত্র কুরআনের কোন আয়াতদ্বয় পর পর তিনরাত তিলাওয়াত করলে শয়তান গৃহে প্রবেশ করবে না?

✍ সূরাতুল বাক্বারার শেষ দুই আয়াত (২৮৫ ও ২৮৬ নম্বর আয়াত)।

❖ পবিত্র কুরআনের কোন সূরাদ্বয় তিলাওয়াত করলে কিয়ামতের পাঠে তা বান্দার জন্য সুপারিশ করবে।

✍ সূরাতুল বাক্বারাহ্ ও সূরা আ-লি ‘ইমরান তিলাওয়াত করলে কিয়ামতের মাঠে সূরাদ্বয় তিলাওয়াতকারীর জন্য আল্লাহ তা‘আলার কাছে সুপারিশ করবে।

❖ দাজ্জালের ভয়ংকর ফিতনা থেকে বাঁচতে পবিত্র কুরআনের কোন সূরা তিলাওয়াত করতে হবে?

✍ সূরাতুল কাহ্ফের প্রথম ও শেষ দশ আয়াত।

❖ পবিত্র কুরআনের কোন সূরাকে কবরের ‘আযাব প্রতিরোধকারী সূরা বলা হয়?

✍ সূরাতুল মুল্ক্। যা প্রতি রাতে তিলাওয়াত করলে কবরের ‘আযাব থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যাবে।

❖ পবিত্র কুরআন কোন সূরাসমূহ জুমুআর সালাতে তিলাওয়াত করা সুন্নাত?

✍ সূরাতুল আ’লা, সূরাতুল গা-শিয়াহ্, সূরাতুল জুমু‘আহ্, সূরা ক্বফ প্রভৃতি।

❖ কোন সূরাকে পবিত্র কুরআনের একতৃতীয়াংশ বলা হয়েছে?

✍ ‘সূরাতুল ইখলাস’ পবিত্র কুরআনের একতৃতীয়াংশ তুল্য।

❖ পবিত্র কুরআনের সিজদার আয়াত কতটি এবং কী কী?

✍ পবিত্র কুরআনের সিজদার আয়াতসমূহের তথ্য নিম্নে প্রদত্ত হলো। যথা-

০১. সূরা আল আ‘রাফ/২০৬ আয়াত। ০২. সূরা আর্ রা‘দ/১৫ আয়াত। ০৩. সূরা আন্ নাহ্ল/৫০ আয়াত। ০৪. সূরা বানী ইসরা-ঈল/১০৯ আয়াত। ০৫. সূরা মারইয়াম/৫৮ আয়াত। ০৬. সূরা আল হাজ্জ/১৮ ও ৭৭ আয়াত। ০৭. সূরা আল ফুরক্বান/৬০ আয়াত। ০৮. সূরা আন্ নামল/২৬ আয়াত। ০৯. সূরা আস সাজদাহ্/১৫ আয়াত। ১০. সূরা সোয়াদ/২৪ আয়াত। ১১. সূরা হা-মীম আস সাজদাহ/৩৮ আয়াত। ১২. সূরা আন নাজম/৬২ আয়াত। ১৩. সূরা ইনশিক্বাক্ব/২১ আয়াত। ১৪. সূরা আল ‘আলাক্ব/১৯ আয়াত।

❖ পবিত্র কুরআনে কতজন নবী-রাসূল-এর নাম এসেছে এবং তাদের নাম কী?

✍ পবিত্র কুরআনে ২৫জন নবী-রাসূল (আলাইহিস সালাম)-এর নাম বর্ণিত হয়েছে। তাঁরা হলেন যথাক্রমে–

০১. আদম (আলাইহিস সালাম), ০২. ইদরীস (আলাইহিস সালাম), ০৩. নূহ্ (আলাইহিস সালাম), ০৪. হূদ (আলাইহিস সালাম), ০৫. সালেহ্ (আলাইহিস সালাম), ০৬. ইব্রা-হীম (আলাইহিস সালাম), ০৭. লূত (আলাইহিস সালাম), ০৮. ইসমা‘ঈল (আলাইহিস সালাম), ০৯. ইসহাক (আলাইহিস সালাম), ১০. ইয়াকুব (আলাইহিস সালাম), ১১. ইউসুফ (আলাইহিস সালাম), ১২. শুয়াঈব (আলাইহিস সালাম), ১৩. আইয়ূব (আলাইহিস সালাম), ১৪. যুলকিফল (আলাইহিস সালাম), ১৫. মূসা (আলাইহিস সালাম), ১৬. হারুন (আলাইহিস সালাম), ১৭. দাউদ (আলাইহিস সালাম), ১৮. সুলাইমান (আলাইহিস সালাম), ১৯. ইলিয়াস (আলাইহিস সালাম), ২০. ইয়াসা (আলাইহিস সালাম), ২১. ইউনূস (আলাইহিস সালাম), ২২. জাকারিয়াহ্ (আলাইহিস সালাম), ২৩. ইয়াহ্ইয়া (আলাইহিস সালাম), ২৪. ‘ঈসা (আলাইহিস সালাম) এবং ২৫. মুহাম্মদ (ﷺ)।

❖ পবিত্র কুরআনে কোন নবীর নাম সর্বাধিক এসেছে?

✍ মূসা (আলাইহিস সালাম)-এর নাম, ১৩৫ বার এসেছে।

❖ পবিত্র কুরআনে কোন্ কোন্ ফেরেশ্তার নাম বর্ণিত হয়েছে?

✍ পবিত্র কুরআরে যে সকল ফেরেশ্তার নাম বর্ণিত হয়েছে, তারা হলেন– ০১. জিবরাঈল (আলাইহিস সালাম), ০২. মিকাঈল (আলাইহিস সালাম), ০৩. হারুত (আলাইহিস সালাম), ০৪. মারূত (আলাইহিস সালাম) এবং জাহান্নামের দ্বাররক্ষক মালিক (আলাইহিস সালাম)।

❖ নবী-রাসূল ব্যতীত কোন কোন ঈমানদার পুণ্যবান ব্যক্তির কথা পবিত্র কুরআনে এসেছে?

✍ নবী-রাসূল ব্যতীত যে সকল পুণ্যবান ব্যক্তির নাম পবিত্র কুরআনে বর্ণিত হয়েছে তাঁরা হলেন– ০১. লুক্বমান (রাযিয়াল্লাহু-হু), ০২. সাহাবী যায়িদ ইবনু হারিসাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু), ০৩. বাদশাহ্ যুলকারনাইন (রাযিয়াল্লাহু-হু), ০৪. ‘ইমরান (রাযিয়াল্লাহু-হু), ০৫. মারইয়াম (রাযিয়াল্লাহু-হু), ০৬. উজাইর (রাযিয়াল্লাহু-হু), ০৭. তালূত (রাযিয়াল্লাহু-হু)।

❖ কোন কোন ফাসিক ও পাপাচারীর কথা পবিত্র কুরআনে বর্ণিত হয়েছে?

✍ পবিত্র কুরআনে যে সকল পাপাচারীর কথা বর্ণিত হয়েছে তারা হলো– ০১. ফিরআউন, ০২. কারূন, ০৩. হামান, ০৪. তুব্বা (ইয়েমেনের শাসরেক উপাধি) ০৫. সামেরি, ০৬. জালুত, ০৭. আবূ লাহাব এবং ০৮. আজর।

❖ আল কুরআনে প্রকাশ্যে একমাত্র কোন রমনীর নাম এসেছে?

✍ নবী ‘ঈসা (আলাইহিস সালাম)-এর মাতা মারইয়াম (আলাইহিস সালাম)-এর নাম।

❖ আল কুরআন কোন কোন মূর্তির নাম আছে?

✍ আল কুরআনে যে সকল মূতির নাম বর্ণিত হয়েছে সেগুলো– লাত, উজ্জা, মানাত, ওয়াদ, সুওয়া, ইয়াগুস, ইয়াউক, বাআল এবং নাসর।

❖ আল কুরআনে মোট কতটি সম্প্রদায়ের নাম বর্ণিত হয়েছে?

✍ মোট ১৪টি সম্প্রদায়ের নাম বর্ণিত হয়েছে।

❖ আল কুরআনে ৬টি ধ্বংসাপ্রাপ্ত জাতির কথা বলা হয়েছে, সেই জাতিগুলো নাম কী?

✍ মোট ৬টি ধ্বংসপ্রাপ্ত সম্প্রদায়ের নাম বর্ণিত হয়েছে। সেগুলো– ০১. ক্বওমে নূহ্ [নূহ্ (আলাইহিস সালাম)-এর সম্প্রদায়]; ০২. ক্বওমে সামুদ [সালেহ্ (আলাইহিস সালাম)-এর সম্প্রদায়]; ০৩. ক্বওমে লূত [লূত (আলাইহিস সালাম)-এর সম্প্রদায়]; ০৪. ক্বওমে আদ [হূদ (আলাইহিস সালাম)-এর সম্প্রদায়]; ০৫. ক্বওমে মাদইয়ান [শু'আইব (আলাইহিস সালাম)-এর সম্প্রদায়] এবং ০৬. ক্বওমে মূসা [মূসা (আলাইহিস সালাম)-এর সম্প্রদায়]।

❖ আল কুরআনে কোন কোন মসজিদের নাম উল্লেখ আছে?

✍ ০১. মসজিদে হারাম, ০২. মসজিদে নববী, ০৩. মসজিদে কুবা, ০৪. মসজিদে আকসা, ০৫. মসজিদে জিরার।

❖ আল কুরআনে কোন কোন পাহাড়ের নাম আছে?

✍ ০১. তূর পাহাড়, ০২. সাফা পাহার, ০৩. মারওয়া পাহার, ০৪. আরাফাত পর্বত এবং ০৫. জুদি পাহাড়।

❖ পবিত্র কুরআনে কোন কোন ফলের নাম বর্ণিত হয়েছে?

✍ পবিত্র কুরআনে বর্ণিত উল্লেখযোগ্য ফলগুলো– ১. তীন (ডুমুর), ২. যায়তুল (জলপাই সদৃশ), ৩. ইনাব (আঙ্গুর), ৪. রুম্মান (ডালিম) ৫. নাখলুন (খেজুর) ৬. তালহীন (কলা) প্রভৃতি।

❖ পবিত্র কুরআনে কোন কোন ফসল ও সব্জির নাম বর্ণিত হয়েছে?

✍ পবিত্র কুরআনে বর্ণিত উল্লেখযোগ্য ফসলগুলো– ১. ফুম (গম) ২. আদাস (ডাল), ৩. জানজাবিল (আদা), ৪. কিসসাউ (শশা)।

❖ পবিত্র কুরআনের কোন কোন সূরার নামকরণ করা হয়েছে নবীগণের নামে?

✍ যে সকল সূরা নবী (আলাইহিস সালাম)-এর নামে নামকরণ হয়েছে সেগুলো– ০১. সূরা ইব্রা-হীম, ০২. সূরা হূদ, ০৩. সূরা ইউসূফ, ০৪. সূরা ইউনূস, ০৫. সূরা নূহ্ এবং সূরা মুহাম্মদ।

❖ পবিত্র কুরআনের কোন কোন সূরার নামকরণ করা হয়েছে প্রাণির নামে?

✍ যে সূরাসমূহ প্রাণীর নামে নামকরণ করা হয়েছে তা হলো– ১. সূরাতুল বাক্বারাহ্ (গাভী), ২. সূরাতুন নাহ্ল (মৌমাছি), ৩. সূরাতুন নামল (পিপীলিকা), ৪. সূরা আল আনকাবূত (মাকড়শা) এবং ৫. সূরাতুল ফীল (হাতি)।

❖ পবিত্র কুরআনের কোন সূরার কত নম্বর আয়াতে ঘোড়া ও খচ্চরের নাম বর্ণিত হয়েছে?

✍ সূরাতুল আন নাহ্লের ৮ নম্বর আয়াতে ঘোড়া ও খচ্চরের নাম বর্ণিত হয়েছে।

❖ পবিত্র কুরআনের কোন সূরার কত নম্বর আয়াতে কাক ও হুদহুদ পাখির কথা বর্ণিত হয়েছে?

✍ সূরাতুল মায়িদার ৩১ নম্বর আয়াতে কাক ও সূরা আন্ নামলের ২০ নম্বর আয়াতে হুদহুদ পাখির কথা বর্ণিত হয়েছে।

❖ পবিত্র কুরআনের কোন সূরার কত নম্বর আয়াতে মাছের কথা বর্ণিত হয়েছে?

✍ সূরা আস্ সফ্ফাত-এর ১৪২ নম্বর আয়াতে মাছের কথা বর্ণিত হয়েছে।

❖ পবিত্র কুরআনে বর্ণিত জান্নাতের স্তরসমূহ কী কী?

✍ পবিত্র কুরআনে বর্ণিত জান্নাতের স্তরগুলো– ০১. জান্নাতুল ফিরদাউস, ০২. দারুর মাকাম, ০৩. দারুল ক্বারার, ০৪. দারুস সালাম, ০৫. জান্নাতুল মা'ওয়া, ০৬. দারুন নাঈম, ০৭. দারুল খুল্দ এবং ০৮. জান্নাতুল আদ্ন।

❖ পবিত্র কুরআনে বর্ণিত জাহান্নামের স্তরসমূহ কী কী?

✍ পবিত্র কুরআনে বর্ণিত পর্যায়ক্রমে নিম্নগামী জাহান্নামের স্তরগুলো– ০১. জাহান্নাম, ০২. হুতামাহ্, ০৩. সাক্বার, ০৪. জাহীম, ০৫. লাযা, ০৬. সাঈর এবং ০৭. হাবিয়া।

❖ আল কুরআনের হরকাত এবং নুকতার প্রচলন করার নির্দেশ প্রদান করেন কে?

✍ হাজ্জাজ ইবনু ইউসুফ ৭৫ হিজরিতে।

❖ কুরআনে হরকত (যের যবর পেশ ইত্যাদি) সংযোজন করেন কে?

✍ খলীল বিন আহমাদ আল ফারাহীদী (রাহিমাহুল্লাহ)।

❖ কে সর্বপ্রথম আল কুরআনের বাংলা অনুবাদ করেন?

✍ মাওলানা আমীর উদ্দীন বসুনিয়া ১৮০৮ সালে।

❖ সর্বপ্রথম পুস্তক আকারে বাংলায় কুরআনের অনুবাদ প্রকাশ করেন কে?

✍ গিরিশ চন্দ্রসেন ১৮৮৬ সালে।

আল-কুরআন ও সহীহ হাদীসের আলোকে এবং বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর ও সালাত টাইম-এর সময় সমন্বয়ে ঢাকা জেলার

দৈনন্দিন সালাতের সময়সূচি

নভেম্বর

তারিখ	ফজর	সূর্যোদয়	যোহর	আসর	মাগরিব	ঈশা
০১	০৪:৪৩	০৬:০৩	১১:৪৩	০২:৫৬	০৫:২১	০৬:৫১
০২	০৪:৪৩	০৬:০৪	১১:৪৩	০২:৫৫	০৫:২০	০৬:৫০
০৩	০৪:৪৪	০৬:০৫	১১:৪৩	০২:৫৫	০৫:১৯	০৬:৪৯
০৪	০৪:৪৪	০৬:০৫	১১:৪৩	০২:৫৪	০৫:১৯	০৬:৪৯
০৫	০৪:৪৫	০৬:০৬	১১:৪৩	০২:৫৪	০৫:১৮	০৬:৪৮
০৬	০৪:৪৫	০৬:০৬	১১:৪৩	০২:৫৪	০৫:১৮	০৬:৪৮
০৭	০৪:৪৬	০৬:০৭	১১:৪৩	০২:৫৩	০৫:১৭	০৬:৪৭
০৮	০৪:৪৬	০৬:০৮	১১:৪৩	০২:৫৩	০৫:১৭	০৬:৪৭
০৯	০৪:৪৭	০৬:০৮	১১:৪৩	০২:৫৩	০৫:১৬	০৬:৪৬
১০	০৪:৪৭	০৬:০৯	১১:৪৩	০২:৫২	০৫:১৬	০৬:৪৬
১১	০৪:৪৮	০৬:১০	১১:৪৩	০২:৫২	০৫:১৫	০৬:৪৫
১২	০৪:৪৮	০৬:১০	১১:৪৩	০২:৫২	০৫:১৫	০৬:৪৫
১৩	০৪:৪৯	০৬:১১	১১:৪৪	০২:৫২	০৫:১৫	০৬:৪৫
১৪	০৪:৪৯	০৬:১১	১১:৪৪	০২:৫১	০৫:১৪	০৬:৪৪
১৫	০৪:৫০	০৬:১২	১১:৪৪	০২:৫১	০৫:১৪	০৬:৪৪
১৬	০৪:৫০	০৬:১৩	১১:৪৪	০২:৫১	০৫:১৪	০৬:৪৪
১৭	০৪:৫১	০৬:১৩	১১:৪৪	০২:৫১	০৫:১৩	০৬:৪৩
১৮	০৪:৫২	০৬:১৪	১১:৪৪	০২:৫১	০৫:১৩	০৬:৪৩
১৯	০৪:৫২	০৬:১৫	১১:৪৫	০২:৫০	০৫:১৩	০৬:৪৩
২০	০৪:৫৩	০৬:১৫	১১:৪৫	০২:৫০	০৫:১৩	০৬:৪৩
২১	০৪:৫৩	০৬:১৬	১১:৪৫	০২:৫০	০৫:১২	০৬:৪২
২২	০৪:৫৪	০৬:১৭	১১:৪৫	০২:৫০	০৫:১২	০৬:৪২
২৩	০৪:৫৪	০৬:১৮	১১:৪৬	০২:৫০	০৫:১২	০৬:৪২
২৪	০৪:৫৫	০৬:১৮	১১:৪৬	০২:৫০	০৫:১২	০৬:৪২
২৫	০৪:৫৬	০৬:১৯	১১:৪৬	০২:৫০	০৫:১২	০৬:৪২
২৬	০৪:৫৬	০৬:২০	১১:৪৭	০২:৫০	০৫:১২	০৬:৪২
২৭	০৪:৫৭	০৬:২০	১১:৪৭	০২:৫০	০৫:১২	০৬:৪২
২৮	০৪:৫৭	০৬:২১	১১:৪৭	০২:৫০	০৫:১২	০৬:৪২
২৯	০৪:৫৮	০৬:২২	১১:৪৮	০২:৫০	০৫:১২	০৬:৪২
৩০	০৪:৫৯	০৬:২২	১১:৪৮	০২:৫০	০৫:১২	০৬:৪২

সূচীপত্র

THE WEEKLY ARAFAT, REG. DA.60 ■ PRICE Tk. 25.00

بسم الله الرحمن الرحيم

مدرسة رابطة المحسنات للبنات

রাবেতাতুল মোহ্সানাত মহিলা মাদ্রাসা

ইসলামী ও সাধারণ শিক্ষার সমন্বয়ে সালাফী মানহাজের আদলে একটি যুগোপযোগী আধুনিক দ্বীনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

ভর্তি চলছে

মুসলিমনগর, কাঞ্চন পৌরসভা
রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ

বিভাগ সমূহ

- নূরানী
- হিফজ
- কিতাব (প্লে থেকে একাদশ শ্রেণি পর্যন্ত)
- বিশেষ কোর্স (স্কুল, কলেজ ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের ছাত্রীরা ভর্তি হতে পারবে)

প্লে-সানাবিয়া
(একাদশ) পর্যাক্রমে দাওরা
ফরম বিতরণ ও ভর্তি
১ থেকে ৫ জানুয়ারী

আপনার শিশু হোক অহীর আলোয় আলোকিত....

আমাদের বৈশিষ্ট্য

- কিতাব-সুন্নাহ ও সহীহ আক্বিদার আদলে মানসম্পন্ন শিক্ষার পরিবেশ
- কওমি ও আধুনিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সিলেবাসের সমন্বয়ে প্রণীত সিলেবাস অনুসরণ
- দক্ষ ও অভিজ্ঞ শিক্ষক, শিক্ষিকা দ্বারা পাঠদান ও পরিচালনা
- অত্যন্ত মনোরম পরিবেশে সর্বাধুনিক সুবিধা সমৃদ্ধিত নিজস্ব আবাসিক ব্যবস্থাপনা
- দৈনিক ৩বার আদর্শ খাবার ও প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যবস্থা
- শিক্ষার্থীদের সার্বক্ষণিক নিরাপত্তা প্রদানে প্রহরীর ব্যবস্থা
- মাদ্রাসা বোর্ডের সকল পরীক্ষায় অংশগ্রহণ ও কাঙ্খিত ফলাফলের জন্য বিশেষ গুরুত্ব প্রদান
- অমনোযোগী ও দূর্বল ছাত্রীদের প্রতি বিশেষ তত্ত্বাবধান
- নিয়মিত বিনোদন ও সাংস্কৃতিক চর্চা এবং নৈতিক মান উন্নয়নে বিশেষ তা'লিমীর ব্যবস্থা
- আরবি, বাংলা ও ইংরেজি হাতের লিখা ও ভাষা প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা
- শিক্ষার্থীদের কম্পিউটার প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা
- মেধানুযায়ী দ্রুত হিফজ সম্পন্ন করানো এবং নতুন হিফজ সম্পন্ন হাফেজাদের শুনানির সুব্যবস্থা
- নুরানী ট্রেনিং প্রাপ্ত শিক্ষিকা দ্বারা নুরানী বিভাগ পরিচালনা
- তাহ্ফিজ ও নূরানী বিভাগে তৃতীয় থেকে পঞ্চম শ্রেণী সমপর্যায়ের শর্ট সিলেবাস পড়ানো
- ১ বছর মেয়াদী বিশেষ কোর্স বিভাগের শিক্ষার্থীদের অভিজ্ঞ শিক্ষক দ্বারা শিক্ষা দেওয়া হয় এবং কোর্স শেষে শিক্ষার্থীদের মান অনুযায়ী কিতাব বিভাগে ভর্তির সুযোগ দেওয়া হয়

- আবাসিক
- অনাবাসিক
- ডে-কেয়ার

krmmm2021@gmail.com | *রাবেতাতুল মোহ্সানাত মহিলা মাদ্রাসা* | যোগাযোগ: 01741-113040, 01879869614, 01879869674

প্রফেসর ড. এম.এ. বারীর পক্ষে **অধ্যাপক ডক্টর আব্দুল্লাহ ফারুক** কর্তৃক **আল হাদীস প্রিন্টিং এন্ড পাবলিশিং** হাউজ: ৯৮, নওয়াবপুর রোড, ঢাকা-১১০০, বাংলাদেশ হতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত

সৌদি আরবের শীর্ষ ১০ ইউনিভার্সিটির অন্যতম এবং আন্তর্জাতিক র‍্যাংকিংভুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের অভিভুক্ত কিং খালিদ ইউনিভার্সিটির সনামধন্য **অধ্যাপক মুহাম্মদ আসাদুল ইসলাম** কর্তৃক পরিচালিত

দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণের জন্য সাভারে আন্তর্জাতিক মানের শিক্ষালয়

মাদরাসাতুল হাসানাহ

ভর্তি চলছে

আপনার
সোনামণির
সুশিক্ষার
নিরাপদ
ঠিকানা

আবাসিক
অনাবাসিক
ডে-কেয়ার

বালক ও বালিকা পৃথক শাখা

আমাদের নিয়মিত অ্যাকাডেমিক প্রোগ্রাম

তাহফীজুল কুরআন
মক্তব । নাজেরা । হিফজ । রিভিশন

ইসলামী শিক্ষা বিভাগ
হিফজসহ প্লে-অষ্টম শ্রেণি
(ক্রমশ উচ্চতর পর্যায়)

উন্মুক্ত গণশিক্ষা প্রোগ্রাম
আধুনিক ভাষা শিক্ষা কোর্স
ইসলামী শরীয়ার বিষয়ভিত্তিক কোর্স
কুরআন শিক্ষা
দারসুল হাদীস প্রোগ্রাম

পরিচালনায়

অধ্যাপক মুহাম্মদ আসাদুল ইসলাম
Adjunct Faculty
Manarat International University.
Former Faculty
King Khalid University &
University of Bisha, KSA.

বি-৯৭, বাজার রোড, সাভার, ঢাকা।
01894762337, 01973936173